মধ্যযুগের সভ্যতা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত (১৯৮১) সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস।
T.B. No. VII/H/81/76 dated 8.1.81

মধ্যযুগের সভ্যতা

(সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

ডঃ শিশির কুমার মিত্র, এম.এ., এল.এল.বি. ডি.ফিল. এফ.এ.এস
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী, এশিয়াটিক সোসাইটি

ভারত পাবলিশার্স
১৩ কলেজ রো,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৮১
তৃতীয় প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮১
চতুর্থ প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮২

[ভারত সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মূল্য : টা ১০·৫০

[মুদ্রিত মূল্যের বেশী কেহ দিবেন না, ইহাই অনুরোধ]

ভারত পাবলিশার্স এর পক্ষে শ্রীমতী স্বাতী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
শ্রীআর. চক্রবর্তী, চক্রবর্তী প্রিন্টিং ওয়াকর্স
৪৪/২এ, সিমলা রোড, কলি-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগের লক্ষণ

(ক) **ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ঃ** ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মত ; নদীর স্রোতকে যেমন ভাগ করা যায় না, ইতিহাসেরও তেমনিই ভাগ করা দুষ্কর। প্রাচীনতম যুগ হইতে বিবর্তনের ফলেই মানুষের সভ্যতা সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য বলা হয়, ইতিহাস ধারাবাহিক। তথাপি আমাদের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য আমরা ইতিহাসকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে ভাগ করিয়া থাকি।

ইতিহাসে প্রাচীন যুগের শেষ হইতে আধুনিক যুগের আরম্ভের অন্তবর্তী সময়কে বলা হয় 'মধ্যযুগ'।

(খ) **ইউরোপে মধ্যযুগ ঃ** ইউরোপে মধ্যযুগের পূর্বে ছিল রোমান সভ্যতার সুবর্ণ যুগ। ইটালীর একটি ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র হইতে রোমের শক্তি ক্রমশঃ ভূমধ্যসাগরের চারিপাশ ব্যাপিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস সীজারের সময় (খৃীঃ পূঃ ২৭—১৪ খৃীঃ) হইতে প্রায় চারিশত বৎসর সাম্রাজ্যের গৌরব অটুট ছিল। ইহা পৃথিবীর একটি বিরাট অংশকে দান করিয়াছিল শান্তি ও শাসন-শৃঙ্খলা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। কিন্তু দুর্ধর্ষ জার্মান উপজাতিগুলির আক্রমণে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি জার্মান নেতা ওডোয়াকারের হাতে শেষ রোমান সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতন হয়। ইহা ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ইহার ফলে ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে ও বর্বর অর্ধসভ্য উপজাতিদের হাতে ঘটে সভ্যতার অবনতি। ইহাই ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা।

পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বৎসর ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলিয়া চিহ্নিত। এই সময়েও ধীরে ধীরে নূতন সভ্যতা মাথা তুলিতে থাকে। কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লকে কেন্দ্র করিয়া যে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে শিল্পে, সভ্যতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাহার অবদানও কম নহে। ইহাই **বাইজান্টাইন** সভ্যতা বলিয়া পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অটোমান তুর্কীদের আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতনের (১৪৫৩ খৃীঃ) সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনঃপ্রচারের

ফলে দেখা দেয় ইউরোপের চিন্তাজগতের নূতন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষা-দীক্ষায়, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংগঠনে এই নবজাগরণ সূচিত করে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়।

(গ) **ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ :** ইউরোপের মত ভারতেও সপ্তম শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অবধি মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে গুপ্তবংশীয়রা ছিলেন মগধের রাজা, দক্ষিণ বিহারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরাক্রমে মগধরাজ্য ক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়; শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় সাম্রাজ্যের সর্বত্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুপ্ত সম্রাটগণের পৃষ্টপোষকতায় যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা গুপ্তযুগকে ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণ যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর (৪৬৭ খ্রীঃ) গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অবশ্য একাধিক ছিল, কিন্তু বার বার মধ্য এশিয়ার বর্বর হূণ জাতির আক্রমণ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল। রাষ্ট্রিক ও আর্থনৈতিক সংগঠনের দুর্বলতাও কেহ কেহ গুপ্ত যুগের অবসানের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন। গুপ্তযুগের বহু তাম্রশাসনে সামন্ত ভূস্বামীদের উল্লেখ দেখা যায়। তাহারা কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। ইউরোপের ইতিহাসেও দেখা গিয়াছে যে সামন্তপ্রথা মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি বিশেষ লক্ষণ।

ভারতের ইতিহাসেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আবার এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তুর্কী-পাঠান সুলতানীর অবসানে মুঘল রাজত্বের অভ্যুদয় হয় (১৫২৬ খ্রীঃ)। মুঘল সম্রাট আউরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রীঃ) মধ্যযুগের সীমারেখা।

(ঘ) **মধ্যযুগের লক্ষণ :** এক একটি যুগ কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিচিত হয়, যেমন, মধ্যযুগের লক্ষণ বলিতে বুঝায় প্রাচীন সভ্যতার অবনতি, সামন্ততন্ত্রের প্রভাব, ভূমিদাস প্রথার বিস্তার প্রভৃতি। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, ইউরোপের বাহিরে অন্যান্য দেশের ইতিহাসে ঐ সময়ে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং কোন কোন দেশে মধ্যযুগের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি ও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার, চীনে তাঙ্ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ, ভারতে

তুর্কী-পাঠান মুঘল সাম্রাজ্য প্রভৃতি। ভারতের ইতিহাসে এই সময়েও দেখা যায় শিল্প সৃষ্টির নূতন শৈলী, শিক্ষাদীক্ষার নূতনতর বিকাশ, ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপক প্রসার। এক কথায় বলা যায় যে মধ্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা মোটেই স্থিতিশীল ছিল না, বরং তাহার যথেষ্ট গতিশীলতা ছিল। মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মধ্যযুগের একটি নির্দিষ্ট ছক্ বা প্যাটার্ন (pattern) ছিল না; এক এক দেশে এক এক ভাবে ইহার বিকাশ হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। 'মধ্যযুগ' বলিতে কোন্ সময় বুঝায়?

২। ইউরোপে মধ্যযুগের পূর্বেকার সময় কি নামে অভিহিত হইত? কিভাবে তাহার পরিবর্তে মধ্যযুগের স্বচনা হয়?

৩। রোমের প্রথম সম্রাট কে ছিলেন? কোন্ জার্মাননেতা পশ্চিমী রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটান?

৪। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়সীমা সম্বন্ধে কি জান?

৫। ভারতের ইতিহাসে স্বুবর্ণ যুগ কোন্ সময়কে বলা হয়? তাহার পতনের মুখ্য কারণ কি?

৬। ভারতের ইতিহাসেও কি ইউরোপের মত একই সময়সীমা দিয়া মধ্যযুগকে চিহ্নিত করা হয়? ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান কিভাবে ঘটে?

৭। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সর্বত্র মধ্যযুগের বিকাশের কি কোন নির্দিষ্ট ছক ছিল?

৮। মধ্যযুগের প্রধান লক্ষণগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখ। ইউরোপে ঐ যুগে যে অবনতির লক্ষণ দেখা যায় তাহা কি সর্বত্র দেখা গিয়াছিল?

৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—(ক) ইতিহাসের—নদীর—মত। (খ) ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সকল—দেখা যায়, অন্যান্য—ইতিহাসে তাহা দেখিতে—যায়—। (গ) —কেন্দ্র করিয়া পূর্ব—সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। (ঘ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে— —আক্রমণে কনস্টান্টি-নোপ্‌লের—হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

(ক) জার্মান উপজাতিদের রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশঃ রাইন ও দানিয়ুব নদী ছিল রোম সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমানা। উহার অপরদিকে বাস করিত অর্ধসভ্য জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা—ফ্রাঙ্ক, গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি।

জার্মানদের আদি বাসস্থান ছিল ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে, স্কাণ্ডিনেভিয়া-বাল্টিক অঞ্চলে। সেখান হইতে তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে চলিয়া আসে এবং খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছায়। জার্মানগণ আর্যজাতিরই একটি শাখা ছিল। সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সহিত
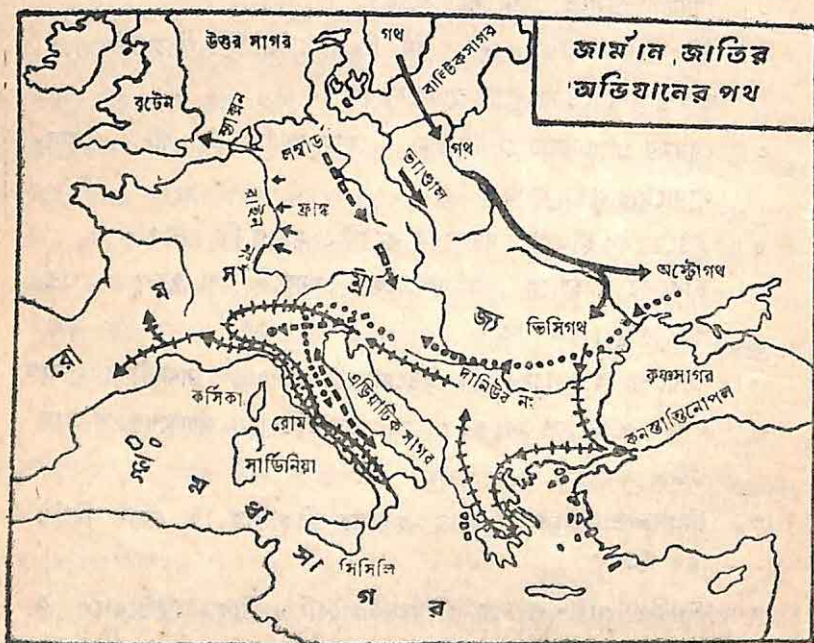
তাহাদের ভাষার অনেক মিল ছিল। কিন্তু তাহাদের উগ্র স্বভাব ও নৃশংসতার জন্য রোমানরা তাহাদের 'বর্বর' বলিত। প্রকৃতপক্ষে তাহারা অনেকেই ছিল যাযাবর। রোমানদের মত সুসভ্য না হইলেও তাহাদেরও নিজস্ব সভ্যতা ছিল। জার্মান জাতির নানা শাখার মধ্যে অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুটগণ ছিল। উত্তরে বাল্টিক উপকূলে, ফ্রাঙ্কগণ ছিল মধ্য ইউরোপে এবং ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগথ

(গথ জাতির পশ্চিম শাখা) ও অস্ট্রোগথ (গথ জাতির পূর্ব শাখা) ছিল পূর্বদিকে, বর্তমান হাঙ্গেরী হইতে দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে। এই সকল জার্মান জাতির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসস্থান ও খাদ্যাভাব ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠে। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ছিল
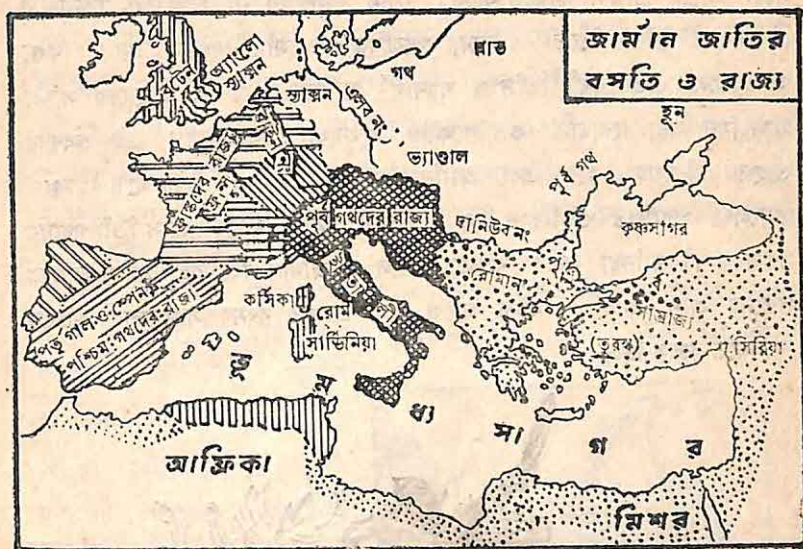
প্রচুর উর্বর চাষের জমি। তাহার আকর্ষণে তৃতীয় শতাব্দী হইতেই তাহারা রাইন ও দানিয়ুব অতিক্রম করিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিও তখন বেশ দুর্বল, অতএব কর্মঠ ও বীর যোদ্ধা জার্মান যুবকদের অনেকে সৈন্যদলে যোগদানের সুযোগ পায়, চাষবাসের জন্যও বহু জার্মানদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে চলে প্রায় দুইশত বৎসর। সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাস করার ফলে জার্মানরাও রোমান আচার আচরণ গ্রহণ করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে শাসনকার্যে ও সৈন্যদলে উচ্চপদও লাভ করে। কিন্তু তখনও সাম্রাজ্যের সীমানার বাহিরে জার্মান জাতির বৃহদংশ বাস করিত।

অবশেষ চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পূর্বদিক হইতে হূণ আক্রমণের ফলে জার্মানদের বসতি ও জীবনযাত্রা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। হূণরা ছিল মধ্য এশিয়ার মঙ্গল জাতির একটি শাখা। চীনের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তাহারা প্রথমে বাস করিত। পীতবর্ণ ও খর্বকায় হূণরা ছিল যাযাবর। শিকার ও পশুচারণ ছিল তাহাদের মুখ্য জীবিকা।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই হান্ সম্রাটদের পরাক্রমে হূণরা চীনের মূল ভূখণ্ড ছাড়িয়া পূর্ব ইউরোপে ডন্ ও ভলগা নদী অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করে। চতুর্থ শতাব্দীতে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশী অস্ট্রোগথদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহাদের আক্রমণের আশঙ্কায় ভিসিগথগণও রোমসাম্রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে থাকে। রোম শাসকগণ না চাহিলেও, সৈন্যদলে যোগদানের প্রতিশ্রুতিতে তাহাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকালেই এত বেশী ভিসিগথ শরণার্থী আসিয়া পড়ে যে তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন করা রোমান কর্তৃপক্ষেরও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই অবস্থায় তাহারা বিদ্রোহ করে এবং অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে (৩৭৮ খ্রীঃ) সম্রাট ভ্যালেন্স পরাজিত ও নিহত হন। পরবর্তী সম্রাট থিওডোসিয়াস ভিসিগথদের সকল দাবী মানিয়া লন। বলিতে গেলে এই জার্মান বিদ্রোহই রোম সাম্রাজ্যের পতনের আশু কারণ। যদিচ আরও প্রায় একশত বৎসর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কোনমতে বজায় ছিল।

অ্যালারিকের রোম লুণ্ঠন

(খ) **অ্যালারিকের রোম আক্রমণঃ** অ্যালারিক ছিলেন বিদ্রোহী ভিসিগথদের নেতা। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ হইয়া যায়; পূর্বাংশ লাভ করেন আর্কাডিয়াস, কনস্টান্টিনোপল বা বাইজান্টিয়াম হয় তাঁহার রাজধানী ও পশ্চিম ভাগ লাভ করেন হনোরিয়াস, রোম তাঁহার রাজধানী। দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট হইল। উভয় পক্ষে সামরিক ক্ষমতা জার্মানদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিম সাম্রাজ্যের প্রধান

সেনাপতি ছিলেন ষ্টিলিকো নামে একজন ভ্যাণ্ডাল। আর পূর্ব সাম্রাজ্যের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন অ্যালারিক। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল অপরের শক্তি খর্ব করা, এজন্য দুই পক্ষে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম লাগিয়া থাকিত। ভিসিগথদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্কাডিয়াস অ্যালারিককে ষ্টিলিকোর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন। অ্যালারিকও ইটালী আক্রমণ করেন। কিন্তু ষ্টিলিকোর নেতৃত্বে রোমান বাহিনী উহা প্রতিরোধ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অল্পকাল পরেই ষ্টিলিকো ও তাঁহার অনুচরগণ রোমানদের চক্রান্তে নিহত হন। অ্যালারিক সেই সুযোগে আবার ইটালী আক্রমণ করেন (৪১০ খ্রীঃ) ও প্রায় বিনা বাধায় রোমনগরীতে চালান হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডবলীলা। এই ঘটনার পরেই আফ্রিকা যাত্রার প্রাক্কালে অ্যালারিকের মৃত্যু হয়। ইতিহাসে অ্যালারিকের নাম রোমের ধ্বংসকারী বলিয়া কুখ্যাত।

(গ) **অ্যাটিলার রোম আক্রমণ**ঃ হূণদের মধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি এক দুর্দান্ত বীর নেতার আবির্ভাব হয়। তাহার নাম অ্যাটিলা। কদাকার ও ভীষণ প্রকৃতি অ্যাটিলা কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় ছিলেন যেমন নিপুণ তেমন নৃশংস। তখনকার লেখকগণ তাঁহাকে 'বিধাতার অভিশাপ' (scourge of God) বলিয়া বর্ণনা করেন। বর্তমান হাঙ্গেরীতে ছিল অ্যাটিলার রাজ্য। ক্রমশঃ শক্তি বিস্তার করিয়া তিনি মধ্য এশিয়া হইতে পশ্চিম ইউরোপের রাইন পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া কোনমতে নিজরাজ্য রক্ষা করেন। তাহার পর

অ্যাটিলার রোম আক্রমণ

অ্যাটিলা প্রচণ্ড বেগে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের গল প্রদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু সেনাপতি আইসিয়াসের নেতৃত্বে রোমান, ভিসিগথ, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জাতির সম্মিলিত বাহিনী হূণদের প্রতিরোধ করে। কিন্তু পর বৎসর (৪৫২ খ্রীঃ)

অ্যাটিলা আরও দুরন্ত ভাবে ইটালীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন ও প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। তাহার অল্পকাল পরেই আকস্মিকভাবে অ্যাটিলার মৃত্যু হয় এবং হূণ সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হয়।

(ঘ) **ভ্যান্ডাল নেতা গ্যেসেরিকের রোম আক্রমণঃ** ভিসিগথরা যখন ইটালী আক্রমণে ব্যস্ত, সেই সময় ভ্যাণ্ডাল নামে আর এক জার্মান জাতি রাইন সীমান্ত পার হইয়া গল প্রদেশে (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করে। কিছুকালের মধ্যেই তাহারা গল হইতে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কার্টাজেনা পর্যন্ত দখল করিয়া লয় এবং নৌবাহিনী গড়িয়া তুলে। সম্রাট হনোরিয়াসের নির্দেশে ভিসিগথরা ভ্যাণ্ডালদের স্পেন হইতে বিতাড়িত করে বটে, কিন্তু তাহারা নৌবহরের সাহায্যে উত্তর আফ্রিকায় যাইয়া এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করে (৪২৯ খ্রীঃ)। ভ্যাণ্ডালদের এই অভিযানের নেতা ছিলেন কূটকুশলী গ্যেসেরিক। দশ বৎসরের মধ্যে গ্যেসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডাল রাজ্য উত্তর আফ্রিকার মরক্কো হইতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, প্রাচীন কার্থেজ হয় তাহার নূতন রাজধানী। নৌশক্তিতে বলীয়ান ভ্যাণ্ডালগণ ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরী অবরোধ করে। পশ্চিম সাম্রাজ্যের পরাক্রমশালী সেনাপতি আইসিয়াস তখন শত্রুদের চক্রান্তে নিহত, প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রোম ভ্যাণ্ডালদের হাতে ধ্বংস হয়। ইংরেজী vandalism শব্দটি ভ্যাণ্ডালদের ধ্বংসলীলার স্মৃতি বহন করে। আর বিশ বৎসর পর ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ওডোয়াকার শেষ সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়।

(ঙ) **জার্মান সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় জীবনঃ** জার্মানদের জীবন যাত্রায় সবিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় জুলিয়াস সীজারের ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের রচনায়। সাধারণতঃ জার্মানরা ছিল দীর্ঘদেহী, প্রশস্তবক্ষ এবং গৌরবর্ণ; তাহাদের চুলের রং লালচে ও চোখ নীল। প্রথমে তাহারা যাযাবর অবস্থায় ছিল, পরে ছোট ছোট গ্রামে তাহারা বসতি স্থাপন করে। শিকার, পশুপালন ও চাষবাসই ছিল তাহাদের মুখ্য জীবিকা। রোমানদের মত তাহাদের সভ্যতা নগরভিত্তিক ছিল না, ছিল গ্রামীণ। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গ্রামগুলি মাটির উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা থাকিত। বাড়ীগুলি সাধারণতঃ মাটি ও কাঠের তৈরী হইত, আর উপরে আচ্ছাদন থাকিত খড়ের বা পাতার। জার্মানদের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তবে তাহারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং মদ্যপান ও জুয়াখেলায় তাহাদের বিশেষ আসক্তি ছিল।

জার্মানদের রাষ্ট্রিক গঠনের ভিত্তি ছিল রাজতন্ত্র, তবে রাজাকে জাতির 'সাধারণ সভার' মত অনুযায়ী চলিতে হইত। তিনি স্বৈরাচারী হইতে পারিতেন না। জার্মানরা খুব স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি, প্রাচীনকাল হইতেই তাহাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খুব বেশী ছিল। সমাজে রাজা ও রাজপরিবার ছাড়া একটি অভিজাত শ্রেণী ছিল, যাহাদের সাধারণ শ্রেণী হইতে মর্যদা বেশী ছিল। সর্বনিম্নে ছিল দাস শ্রেণী। রোম সাম্রাজ্যের উপকণ্ঠে দীর্ঘকাল বাস করার ফলে রোমান সভ্যতার কিছু কিছু ভাবধারা জার্মানদের মধ্যে প্রচলিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে তাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তাহার ফলে জার্মানদের জীবনযাত্রার ধারা অনেক পাল্টাইয়া যায়। পূর্বে তাহারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিত। যেমন—সূর্য, বিদ্যুৎ ঝড় প্রভৃতি। সপ্তাহের দিনগুলির নামও দেবতাদের নাম অনুযায়ী হইয়াছে যেমন, থার্সডে (বৃহস্পতিবার) হইয়াছে 'থর' (Thor) নামক ঝড়ের দেবতার নামে। জার্মানদের বিচারপদ্ধতি বা আইন-কানুন সুগঠিত ছিল না, এক এক জাতির ব্যবস্থা এক এক রকমের ছিল। রোমান আইনের মত উচ্চমানের সামাজিক নীতির প্রবর্তন জার্মানদের মধ্যে হয় নাই। কিন্তু সাহস, দৈহিক শক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তায় জার্মানরা রোমানদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল বলা যায়।

অনুশীলনী

১। জার্মানদের আদিবাসস্থান কোথায় ছিল? তাহারা ইউরোপের কোন্ কোন্ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে?

২। জার্মানরা কি কারণে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করে? তাহার ফল কি হইয়াছিল?

৩। হূণ জাতি কোথায় বাস করিত? চতুর্থ শতাব্দীতে তাহারা কোন্ জার্মান জাতিকে আক্রমণ করে? তাহার ফলাফল সম্বন্ধে কি জান?

৪। অ্যালারিকের রোম আক্রমণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।

৫। অ্যাটিলা কে ছিলেন? তাঁহাকে 'বিধাতার অভিশাপ' বলা হইত কেন?

৬। গ্যেসেরিক কোন্ জাতির নেতা ছিলেন? তিনি কোথায় রাজ্য স্থাপন করেন? তাঁহার রোম আক্রমণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। জার্মানদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

৮। সংক্ষেপে লিখ :—(ক) অষ্ট্রোগথ ও ভিসিগথ, (খ) ভ্যাণ্ডালিসম্ (vandalism), (গ) থার্সডে।

৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—(ক) রাইন ও—নদী ছিল রোম সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব—। (খ) জার্মানগণ—জাতিরই একটি শাখা ছিল। —,——ও—ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার অনেক মিল ছিল। (গ) হূণরা ছিল মধ্য এশিয়ার —জাতির একটি শাখা। —বর্ণ ও খর্বকায় হূণরা ছিল—। (ঘ) সম্রাট—মৃত্যুর পর তাঁহার—পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ হয়। পূর্বাংশ লাভ করেন—ও পশ্চিম ভাগ—। (ঙ) জার্মানদের জীবনযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়—ও ঐতিহাসিক— —রচনায়।

১০। সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দাও:—(ক) রোমানরা জার্মানদের বর্বর বলিত—হাঁ/না। (খ) হূণরা ছিল—আর্য/মঙ্গোল/জাতির একটি শাখা। (গ) আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে কোন্ সম্রাট পরাজিত হন?—ভ্যালেন্স/থিওডোসিয়াস্ (ঘ) অ্যালারিক কাহাদের নেতা ছিলেন?—হূণ/ভ্যাণ্ডাল/ভিসিগথ (ঙ) জার্মান সভ্যতা ছিল—নগরভিত্তিক/গ্রামীণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগ কি অন্ধকার যুগ

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কিছুদিনের মত ইউরোপে সভ্যতার আলো যেন নিভিয়া যায় ও অন্ধকারের গাঢ় ছায়া নামিয়া আসে। এইজন্য পরবর্তী যুগকে সাধারণভাবে 'অন্ধকার যুগ' (the dark ages) বলা হইয়া থাকে। রোমের সভ্যতার যাহা কিছু ভাল অবদান, দেড়শত বৎসর ক্রমাগত মারামারি, কাটাকাটি চলার ফলে পশ্চিম ইউরোপ হইতে তাহা প্রায় লোপ পায়। যে গৌরবময় রোমসাম্রাজ্য ইউরোপের এক বিশাল অংশকে দান করিয়াছিল রাজনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, তাহা ধ্বংস হইয়া গেলে, গড়িয়া উঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক জার্মান রাজ্য—বৃটেনে অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ফ্রাঙ্ক রাজ্য, স্পেনে ভিসিগথ রাজ্য ও ইটালীতে লম্বার্ড রাজ্য। এই সকল নবগঠিত রাজ্যগুলির মধ্যে চলিত প্রচণ্ড রেষারেষি ও সংঘর্ষ। রাজনৈতিক স্থিরতা বলিতে কিছু ছিল না। তাহার উপর যুদ্ধপ্রিয় স্বভাব ও সংগ্রামী মনোভাব রুচিশীল সভ্যতা সৃষ্টির অনুপযোগী ছিল। এইসব কারণে মধ্যযুগে সভ্যতার মান নিম্নমুখী হইয়া যায় এবং এই যুগকে প্রাচীন যুগের তুলনায় 'অবনতির যুগ', 'অন্ধকার যুগ', 'বর্বর যুগ' প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কিন্তু সত্য সত্যই সমগ্র মধ্যযুগকে সভ্যতার আলোক-বর্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা যায় না। ঐ যুগেও নূতন ভাবে শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে; তাহার বহু নিদর্শন আজও সকলের নিকট সমাদৃত হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে রোমের পতনের পর বিজেতা জার্মান জাতিগুলির মধ্যে নূতন সভ্যতার উদ্ভব হইতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল।

সভ্যতার সেই সঙ্কটকালে দেড়শত বৎসরব্যাপী অরাজকতার ফলে শিক্ষাদীক্ষায় যখন ব্যাপক অবনতি সমাজকে গ্রাস করিতেছিল, সভ্যতার ক্ষুদ্র দীপশিখাটি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন খৃীষ্টান যাজক সম্প্রদায়। এই দায়িত্ব তখনকার কোন রাষ্ট্রীয় সরকার তাঁহাদের উপর অর্পণ করে নাই। যাজকগণ সমাজের কল্যাণ চিন্তায় ও মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই নিজ নিজ গির্জার মঠে মন্দিরে (monasteries) শুরু করিয়া দেন পঠন-পাঠনের কেন্দ্র। যাজক বলিতে শুধু পুরোহিত শ্রেণী (clergy) বুঝাইত না, উৎসাহী শিক্ষক ও ছাত্র, শিল্পী ও লেখক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক, বিচারক ও চিকিৎসক এবং ধর্মোপদেষ্টা প্রভৃতি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই বুঝাইত।

সেইজন্যই দেখা যায় যে, মধ্যযুগের ঘনায়মান অন্ধকারে জ্ঞানান্বেষণের আলোকবর্তিকাটি যাজকদের আগ্রহ ও চেষ্টায় অনির্বাণ ছিল। তাঁহাদের উদ্যোগে গির্জার মঠে মঠে যে পাঠশালা বসে তাহাতে শিক্ষালাভ করিত সকল শ্রেণী ও বর্ণের বিদ্যার্থী। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একত্রে পঠন-পাঠন করিত বিদেশী জার্মানরাও। তাহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। যাজকদের পাঠশালায় পড়ান হইত ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য এবং ধর্ম ও দর্শন। শিক্ষক ও ছাত্র সকলে পবিত্র বাইবেল ও সন্তদের উপদেশাবলীর (gospels) অনুলিপি প্রস্তুত করিত। অনুলিপি প্রণয়নে যে যতটা সুন্দর ছাদে অক্ষর লিখিতে পারিত তাহার চেষ্টা করিত। ইহার ফলে ল্যাটিন ভাষা ও লিপির দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। উপরন্তু ধর্মগ্রন্থ পঠন-পাঠনের ফলে আদর্শ নৈতিক জীবনের চিত্র তাহাদের মনে প্রতিফলিত হয়। উগ্রস্বভাবের উপজাতিগুলির মধ্যেও পাপপুণ্য ভালমন্দের একটা ধারণা গড়িয়া উঠিতে থাকে। দয়া, ক্ষমা, প্রেম প্রভৃতি গুণাবলীর মহিমা তাহাদের নীতিবোধ জাগ্রত করে। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে (পঞ্চম হইতে সপ্তম খৃীষ্টাব্দ) যাজক সম্প্রদায় দ্বারা লালিত হইয়া সভ্যতার ক্ষীণ দীপালোক পরবর্তীকালে উন্নত ও উজ্জ্বলতর সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

অনুশীলনী

১। রোম সাম্রাজ্য পতনের পর কোন্ কোন্ অঞ্চলে জার্মান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ?

২। সত্যই মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলা যায় কি ?

৩। অন্ধকার যুগে শিক্ষা-দিক্ষার দীপশিখাটি কাহারা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন ?

৪। যাজক সম্প্রদায় বলিতে কাহাদের বুঝাইত ?

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর।

(ক) মধ্যযুগকে প্রাচীন যুগের তুলনায় — যুগ, —যুগ, — যুগ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(খ) যাজকের—পড়ান হইত—ভাষা ও—, শিক্ষক ছাত্র সকলে পবিত্র—ও সন্তদের—অনুলিপি প্রস্তুত করিত।

(গ) ধর্মগ্রন্থ—ফলে উপজাতিগুলির মধ্যেও — ও —একটা ধারণা গড়িয়া উঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বাইজাণ্টাইন সভ্যতা

(ক) কনস্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা : খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমানা ভেদ করিয়া জার্মান উপজাতিদের দুর্বার অভিযানে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল তখন বিপর্যস্ত। সেই সময় বিচক্ষণ সম্রাট কনস্টান্টাইন কৃষ্ণ সাগরের উপকণ্ঠে প্রাচীন গ্রীক নগরী বাইজান্টিয়ামে একটি নূতন রাজধানী (নূতন রোম, nova Roma) নির্মাণ করান। সম্রাটের নামে তাহার নাম হয় কনস্টান্টিনোপল বা কনস্টান্টাইনের নগরী (৩৩০ খ্রীঃ)। বর্তমানে ইহা তুরস্কের অন্তর্গত ইস্তাম্বুল শহর।

পশ্চিম ইউরোপে রোমের শক্তি বিনষ্ট হইলে কনস্টান্টিনোপলই হইয়া উঠে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ইহার অন্তর্গত ছিল গ্রীস, বলকান অঞ্চল, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, আর্মেনিয়া, মিশর প্রভৃতি রাজ্য। পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতনের পর আরও প্রায় একহাজার বৎসর এই প্রাচ্য সাম্রাজ্য

বজায় ছিল। ইউরোপে জার্মান আক্রমণের ফলে সভ্যতার আলো ম্লান হইয়া গেলেও গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধারা প্রাচ্য সাম্রাজ্যে প্রবাহিত ছিল।
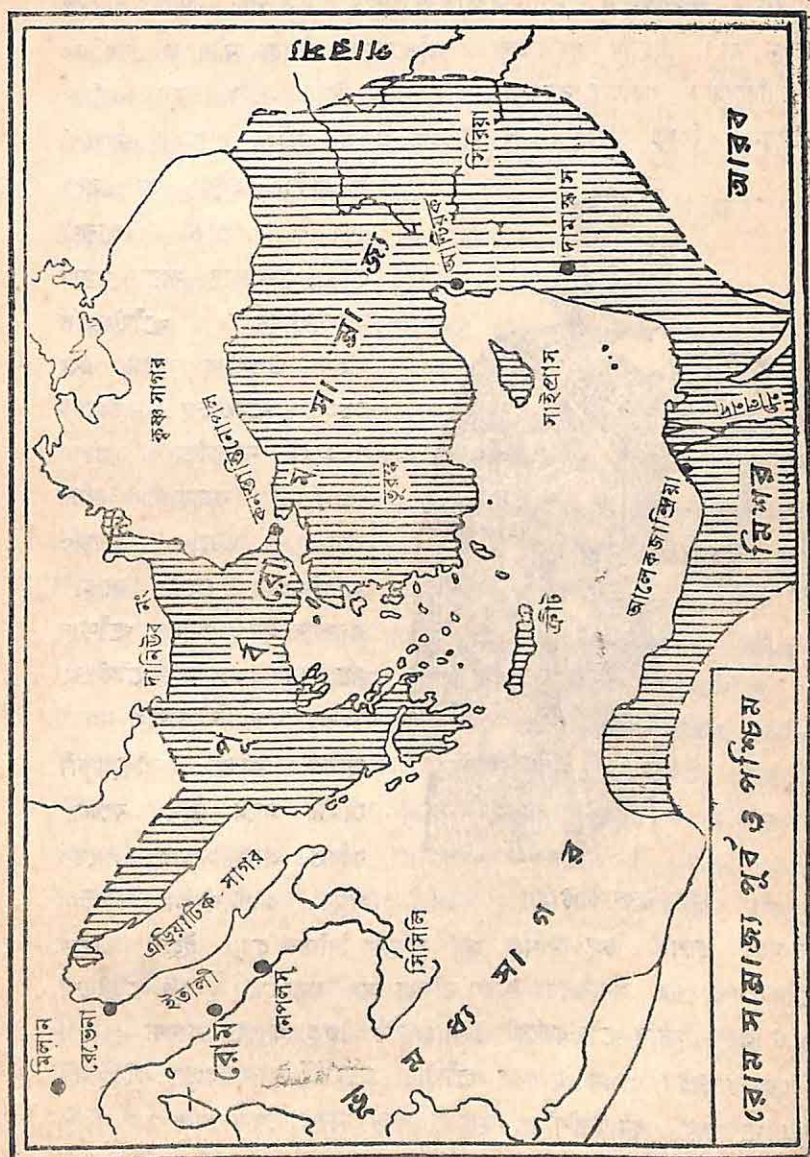
(খ) খ্রীষ্টধর্মকে রাজকীয় মর্যাদা দান: খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকৃতিদান

সম্রাট কনস্টান্টাইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ইহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী।

রোমের শাসকগণ যীশুখ্রীষ্টের প্রতি ও তাঁহার ধর্মের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। ইহুদি ধর্মযাজকদের অভিযোগে তাঁহারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সম্রাটরাও খ্রীষ্টানদের উপর অনেক রকম নির্যাতন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সৎ আচরণ ও সৎ জীবন যাপনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু লোক নবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে স্বয়ং সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীষ্টধর্মের মহিমা উপলব্ধি করেন এবং ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে উহাকে সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি নিজেও খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। কনস্টান্টাইন প্রথম খ্রীষ্টান সম্রাট। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনস্টান্টিনোপলে নগরী স্থাপন করিয়া যীশুজননী মেরীর নামে উৎসর্গ করেন। কথিত আছে সাম্রাজ্য লাভের পূর্বে কনস্টান্টাইন একদিন আকাশে 'ক্রুশের' চিহ্ন দেখিয়া জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। ইহাই তাঁহার খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণ বলিয়া মনে করা হয়। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস খ্রীষ্টধর্মকেই একমাত্র রাষ্ট্রস্বীকৃত ধর্মরূপে ঘোষণা করেন।

সম্রাট কনস্টান্টাইন

কনস্টান্টাইন প্রথম হইতেই খ্রীষ্টান চার্চের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। পরে খ্রীষ্টধর্ম যখন রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা লাভ করিল, তখন চার্চের সংগঠনও ভালভাবে গড়িয়া উঠিল। ধর্মযাজকদের মধ্যেও ছোট বড় নানারকম পদের সৃষ্টি হইল। পোপ (Pope) বা রোমের বিশপ (Bishop) হইলেন সর্ব-প্রধান ধর্মযাজক। কিন্তু পরবর্তীকালে বিবাদ দেখা দিল কনস্টান্টিনোপলের

পেট্রিয়ার্ক (patriarch) বা প্রধান পুরোহিতকে লইয়া। ধর্মের রীতি-নীতি, ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে দুই কেন্দ্রে অহরহ দ্বন্দ্ব চলিত। অবশেষে ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। কনস্টান্টিনোপল হইল 'অর্থোডক্স' (orthodox) বা রক্ষণশীল খ্রীষ্টানদের কেন্দ্র আর অপর দিকে 'ক্যাথলিক' (catholic) বা উদার পন্থীদের কেন্দ্র হইল রোম। যদিচ গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ ও রোমান ক্যাথলিক চার্চ নামে দুই সম্প্রদায়ে খ্রীষ্টানগণ ভাগ হইয়া গেল, তথাপি রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টধর্মের জন্যই সারা ইউরোপ একসূত্রে বাঁধা থাকিল এবং ইহার কৃতিত্ব কনস্টান্টাইনের।

(গ) **সম্রাট জাস্টিনিয়ান** (৫২৭-৫৬৫ খ্রীঃ): ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য যেন আবার হঠাৎ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে এবং জার্মান অধিকৃত অংশগুলি পুনরুদ্ধারের ফলে সাম্রাজ্যের পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া আসে। ইহার গৌরব প্রধানতঃ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের প্রাপ্য। তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে রোমের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার কর্মদক্ষতা ছিল আশ্চর্য রকম, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনই হইত না তাঁহার। সেইজন্য অনেকে মনে করিত যে, তাঁহার উপর অপদেবতা ভর করিত।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর জাস্টিনিয়ানের সংকল্প হইল, সাম্রাজ্যের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরায় দখল করিতে হইবে। এই কার্যে তাঁহার প্রথমে সহায় হইলেন সম্রাজ্ঞী ডিওডোরা ও সেনাপতি বেলিসারিয়াস। ডিওডোরা প্রথম জীবনে অভিনেত্রী ছিলেন, কিন্তু রাণী হিসাবে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। বেলিসারিয়াস ছিলেন একজন প্রতিভাবান সমরনায়ক। অসীম সাহস ও রণনৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াও বিজিত শত্রুর প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন।

জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালের বেশীর ভাগই ব্যয়িত হত হৃত রাজ্য উদ্ধার করার অভিযানে। এইজন্য জাস্টিনিয়ান শক্তিশালী সেনা ও নৌ-বাহিনী গঠন করেন। তাঁহার প্রথম যুদ্ধ হয় পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে (৫৩২ খ্রীঃ)। চীন ও ভারতের বাণিজ্যপথগুলি অধিকার লইয়া পারস্যের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। জাস্টিনিয়ান পারস্যের সহিত যুদ্ধে সুবিধা করিতে পারেন নাই। কারণ, জার্মান কবলিত অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য তিনি ছিলেন বেশী আগ্রহী।

জাস্টিনিয়ান বেলিসারিয়াসের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন উত্তর আফ্রিকাতে এবং সহজেই ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত করিয়া রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন (৫৩৩ খ্রীঃ)। তাহার পর তিনি অষ্ট্রোগথ শক্তি ধ্বংস করিয়া ইটালীও জয় করেন (৫৩৫-৪০ খ্রীঃ)। ভিসিগথদের সুগঠিত রাজ্য ছিল স্পেনে। তাহাদের বিরুদ্ধেও অভিযান পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে সামান্য অংশ দখল করা ছাড়া সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এইভাবে এককালের দ্বিধা-বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্ব পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেনাপতি বেলিসারিয়াসের প্রতি শেষ জীবনে জাস্টিনিয়ান অন্যায় আচরণ করেন। তাঁহার সাফল্যও বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লম্বার্ড জাতি উত্তরদিক হইতে আসিয়া ইটালীর অধিকাংশ দখল করিয়া লয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকাও আরবদের অধিকারে চলিয়া যায়।

জাস্টিনিয়ান

(ঘ) **জাস্টিনিয়ানের আইন গ্রন্থ** (Law Code) : জাস্টিনিয়ানের প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার আইন গ্রন্থ প্রণয়নে। পূর্বে রোমের আইন-কানুনগুলি ছিল খাপছাড়া ও সঙ্গতিবিহীন। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নূতন নূতন আইনের প্রচলন হয়; কিন্তু পুরাতন গুলি বাতিল হয় নাই। ইহার ফলে কোন বিষয়ে আইনের নিশ্চয়তা ছিল না; ছিল না বিচারের কোন স্থিরতা। নানা আইনজ্ঞের নানা মতে একটি প্রবল জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দশজন

আইনজ্ঞের একটি কমিটি নিয়োগ করেন জাস্টিনিয়ান। পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা প্রণয়ন করেন এই বিরাট আইন গ্রন্থ (৫২৮-৩৩ খ্রীঃ)। উহা 'জাস্টিনিয়ানের আইন গ্রন্থ' বলিয়া আজিও বিশ্বের সভ্যসমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইউরোপে ও অন্যান্য অনেক দেশে রোমের আইন অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। আইনের সংস্কার সাধনের জন্য জাস্টিনিয়ানের নাম ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

(ঙ) **জাস্টিনিয়ানের আমলে শিল্পৈশ্বর্য:** সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। ইহা তিনদিকে জলবেষ্টিত ছিল, আর স্থলভাগ রক্ষার জন্য ছিল ৪০ মাইলব্যাপী উচ্চ প্রাচীর। এইজন্য কনস্টান্টিনোপল বহুবার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই যুগে কনস্টান্টিনোপলের মত সুরক্ষিত নগরী দ্বিতীয় ছিল না।

জাস্টিনিয়ানের বিশেষ অনুরাগ ছিল স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রতি। রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি বহু প্রাসাদ, প্রমোদাগার ও গির্জা নির্মাণ করান। তাহাদের মধ্যে প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল তিনটি—সম্রাটের প্রাসাদ, সোফিয়া গির্জা ও হিপোড্রোম নামে নাগরিকদের খেলাধূলার প্রাঙ্গণ (স্ট্যাডিয়ামের মত)। সেখানে আমোদ-প্রমোদের জন্য থাকিত সার্কাস, নৃত্যগীত, রথচালনা প্রতিযোগিতা, অন্যান্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা। হিপোড্রোমে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দস ছিল সবুজ দল এবং নীল দল।
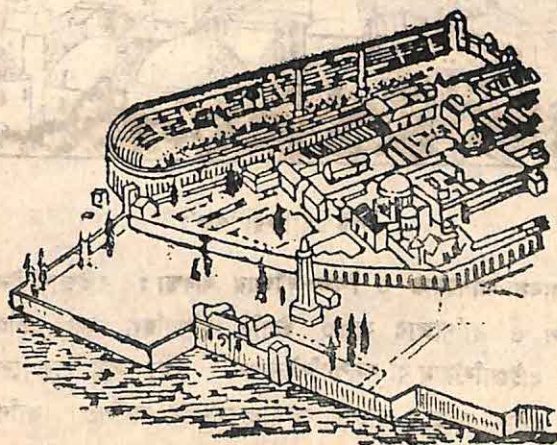
কনস্টান্টিনোপল নগরী

বাইজানস্টাইন শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রঙের বাহার ও অলঙ্করণের জাঁকজমক। সম্রাটের প্রাসাদ ও সেন্ট সোফিয়া গির্জা সেই যুগের স্থাপত্য

শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। সেখানে প্রতিটি কক্ষ সোনালী, নীল প্রভৃতি নানা রঙের কারিগরিতে যেন এক একটি মায়াপুরী বলিয়া মনে হইত। মেঝে, দেওয়াল ও সিলিংয়ে নানারকমের ছবি আঁকা ছিল। তবে এই সকল ছবি সাধারণ রঙ তুলির ছবি নহে, এগুলি 'মোজাইক' (Moasaic) ছবি অর্থাৎ ছোট ছোট রঙীন পাথর বা কাঁচ দিয়া সাজান ছবি। এই ধরনের ছবি বাইজান্টাইন শিল্পের এক অপূর্ব অবদান।

স্থাপত্যে বাইজান্টাইন যুগের বিশেষত্ব প্রকাশ পায় সেণ্ট সোফিয়া গির্জার চতুষ্কোণ দেওয়ালের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ নির্মাণে। এই গির্জা নির্মাণ করিতে দশহাজার শ্রমিকের ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার ভিতরে ছিল স্বর্ণ রৌপ্য ও গজদন্তের কারুকার্য করা কত স্তম্ভ, খিলান দরজা প্রভৃতি।
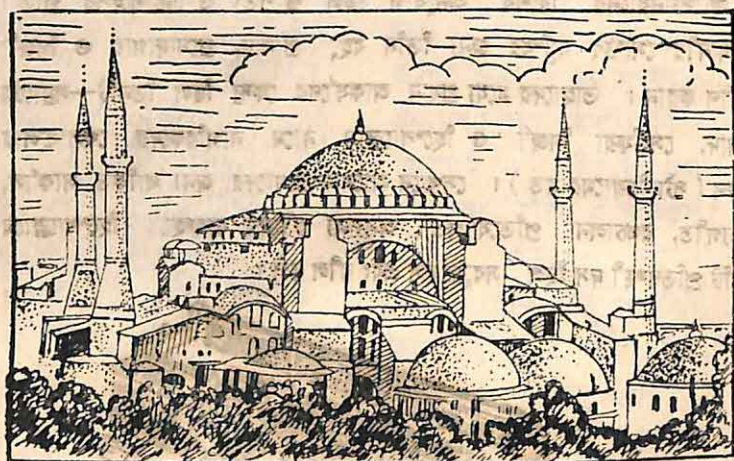
সেণ্ট সোফিয়া গির্জা

(চ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাইজান্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল। বহু দূর দূর দেশ হইতে পণ্যসম্ভার লইয়া হাজার হাজার জাহাজ সেখানে আসিত। বাণিজ্য চলিত প্রধানতঃ মধ্য এশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের সহিত স্থলপথে এবং জলপথেও। উত্তর আফ্রিকা ও ইথিওপিয়া হইতেও কৃষিপণ্য আমদানি করা হইত। রেশম বস্ত্রের খুব চাহিদা ছিল সারা রোম সাম্রাজ্যে, কিন্তু ইউরোপে রেশম

উৎপাদন হইত না। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে কয়েকজন খৃষ্টান সাধু তাঁহাদের পোশাকের মধ্যে লুকাইয়া রেশমের গুটিপোকা লইয়া আসেন চীন দেশ হইতে। সেই সময় হইতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে রেশম শিল্পের সূত্রপাত হয়।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। তাহার প্রধান কেন্দ্র ছিল চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়—কনস্টান্টিনোপল, এথেন্স, অ্যান্টিয়ক ও আলেকজান্দ্রিয়া।

বাইজান্টিয়ামে গ্রীক সাহিত্যের শুধু পঠন-পাঠন হইত না, গ্রীক গ্রন্থগুলি অত্যন্ত কুশলতার সহিত নকল করা হইত। তাহাদের প্রচেষ্টাতেই পরবর্তীকালে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন সংরক্ষিত হইয়াছিল। ঐ যুগের পণ্ডিতগণ সঙ্কলন করেন গ্রীক ভাষায় একাধিক অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থ, বহু ঐতিহাসিক বিবরণ ও সন্তদের জীবনী। চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও কয়েকটি বই রচিত হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। বাইজান্টাইন সভ্যতা কাহাকে বলে? বাইজান্টাইন কথাটির উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে?

২। কনস্টান্টিনোপল কে প্রতিষ্ঠা করেন? ইহার প্রাচীন নাম কি ছিল? বর্তমান নামই বা কি?

৩। কোন্ সম্রাট খ্রীষ্টধর্মকে সরকারী স্বীকৃতি দিয়াছিলেন? তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কারণ কি ছিল?

৪। জাস্টিনিয়ান কিভাবে দ্বিখণ্ডিত রোম সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ করেন? এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক কাহারা ছিল?

৫। জাস্টিনিয়ানের আইনগ্রন্থ (Law Code) সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ইহার জন্য তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইলেন কেন?

৬। বাইজান্টাইন যুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।

৭। টীকা লিখ:—পোপ, পেটিয়ার্ক, থিওডোরা, বেলিসারিয়াস, হিপ্পোড্রোম, সেণ্ট সোফিয়া গির্জা, মোজাইক।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—(ক) কনস্টান্টিনোপল হইয়া উঠে—সাম্রাজ্যের—। (খ) কনস্টান্টাইন——খ্রীষ্টাব্দে—নগরী——নামে উৎসর্গ করেন।

(গ) উদারপন্থী—কেন্দ্র হইল—। (ঘ) জাস্টিনিয়ানের প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার—প্রণয়নে। (ঙ) কনস্টান্টিনোপলের — দিকে ছিল——, আর স্থলভাগে ছিল— মাইলব্যাপী উচ্চ —। (চ) কয়েকজন খ্রীষ্টান — লুকাইয়া চীনদেশ হইতে —— পোকা লইয়া আসেন।

৯। সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দাও :—(ক) কনস্টান্টিনোপল কোন্ সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হয় ?—আর্থোডক্স/ক্যাথলিক। (খ) কোন্ সম্রাট আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন ?——কনস্টান্টাইন/জাস্টিনিয়ান। (গ) হিপ্পোড্রোম ছিল—খেলাধুলার মাঠ/সাঁতারের দীঘি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ধর্ম : প্রসার ও প্রভাব

(ক) আরবদেশ ও তাহার অধিবাসী : যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয়শত বৎসর পরে আরব মরুভূমির মাঝে এক নূতন ধর্মের উদয় হইয়াছিল—ইসলাম। দেশের অধিকাংশ মরুভূমি হইলেও মাঝে মাঝে এক এক স্থানে ছিল উর্বর মরূদ্যান (oasis)। এই সকল জায়গায় স্থায়ী বসতির ফলে ঘরবাড়ী ও শহর গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে মক্কা ও মদিনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

আরবের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদল ছিল শহরবাসী, যাহারা মরূদ্যানগুলিতে বাস করিত। অপরদল ছিল যাযাবর, তাহাদের বলা হইত 'বেদুইন', তাহারাই ছিল সংখ্যায় অধিক। বেদুইনের প্রিয় সঙ্গী ছিল ঘোড়া ও উট। শিকার ও পশুচারণই ছিল তাহাদের মুখ্য জীবিকা। মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ, খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব, দুর্গম পথ বেদুইনদের করিয়া তোলে কষ্টসহিষ্ণু ও বলশালী। তবে বেদুইনরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয় ও অতিথিবৎসল। এমন কি শত্রুও অতিথি হইলে তাহার কোন অনিষ্ট করিত না তাহারা। উৎসবাদিতে নৃত্যগীত এবং কবিতা পাঠের আসর বসিত।

আরবরা ছিল পৌত্তলিক, নানা দেব-দেবীর তাহারা পূজা করিত। মক্কা ছিল তাহাদের পবিত্রতম তীর্থস্থান। সেখানে 'কাবা' নামে প্রাচীন মন্দিরে

ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি হিসাবে পাথরের খণ্ডাংশ। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দেবতা আল্লাহ্‌র প্রতীক একটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড ছিল কাবার মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। তীর্থস্থান বলিয়া মক্কায় বহু লোকের সমাগম হইত এবং মক্কা একটি সমৃদ্ধিশালী শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

(খ) **ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ ঃ** ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে (৫৭০-৭১ খ্রীঃ) মক্কা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত কুরেশ পরিবারে এক

মক্কার কাবা শরীফ

যুগন্ধর মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি হজরৎ মুহম্মদ। অল্প বয়স হইতেই মুহম্মদ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। বাল্যকালে পিতা-মাতাকে হারাইয়া তিনি তাঁহার খুড়ার নিকট আশ্রয় লাভ করেন। লেখাপড়া শেখার সুযোগ তাঁহার হয় নাই; কিন্তু আরব বণিকদের সহিত পারস্য, সিরিয়া, মিশর, সুমের প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া বহু ধর্মের লোকের সহিত মেলামেশা করার তিনি সুযোগ পান। পরে তাঁহার সহিত খাদিজা নামে এক ধনী বিধবার বিবাহ হয়।

তখন আরবরা অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, নানা দেবতা ও উপদেবতার পূজা করিত। মুহম্মদ ভগবৎ প্রেরণায় এক নূতন ধর্মের সন্ধান পাইলেন। সেই ধর্মই ইসলাম ধর্ম নামে জগদ্বিখ্যাত হয়। ইসলাম ধর্মের সার সত্য সংকলিত আছে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কুর্-আন্-শরীফে। মুহম্মদের ধর্মের মূল কথা হইল ঈশ্বর বা আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি নিরাকার। যাহারা মূর্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা করে তাহারা ভ্রান্ত। পৌত্তলিকতার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে আত্মনিবেদন ও উপাসনার দ্বারাই আল্লাহ্র করুণা লাভ করা যায়। আল্লাহ্র নিকট সকল মানুষই সমান, সকলেই ভাই ভাই। এই সাম্যবাদ বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ইসলাম ধর্মের সংগঠনকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করিয়াছিল। হজরত মুহম্মদ আল্লাহ্-প্রেরিত মহাপুরুষ।

প্রথমে মুহম্মদ মক্কা নগরে তাঁহার নূতন ধর্মমত প্রচার করিতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানকার সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণের বিরুদ্ধাচরণে বিভক্ত হইয়া মুহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনা চলিয়া যান। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মনে রাখিবার জন্য এই সময় হইতে 'হিজিরা' (যাত্রা) সাল গণনার প্রবর্তন হয়। মদিনাবাসীদের নিকট মুহম্মদ পাইলেন সহৃদয় ব্যবহার। মদিনাতে মহম্মদের জনপ্রিয়তার ফলে মক্কাবাসীদেরও চৈতন্য হয়। মুহম্মদও সানন্দে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। তখন হইতে মক্কার পুণ্যতীর্থ 'কাবা' ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রস্থল। দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করিল। এতদিন তাহারা বিচ্ছিন্ন বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, হজরত মুহম্মদের ধর্মের যাদু তাহাদের ঐক্যবন্ধ করিল। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদের যখন দেহাবসান হয় তখন ইসলামী আরবগণ এক বলিষ্ঠ সাম্যবাদী রাজশক্তিতে পরিণত হয়।

(গ) ইসলাম ধর্মের প্রসার ঃ খলিফাগণ (The Caliphs) ঃ মুহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক হিসাবে খলিফাপদের সৃষ্টি হয়। 'খলিফা' কথার অর্থ প্রতিনিধি। মুহম্মদের চারিজন প্রধান শিষ্য—আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি—পর পর খলিফাপদ লাভ করেন। তাঁহাদের সাধারণতঃ 'ধর্মপ্রাণ খলিফা' বলা হয়। তাঁহারা সাধু ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং নিজেদের রাজ্যে প্রধান ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে।

(ঘ) **আরব সাম্রাজ্য ঃ** খলিফাদের নেতৃত্বে আরবদের সামরিক শক্তির এক দুরন্ত বিকাশ দেখা যায়। একশত বৎসরের মধ্যে আরববাহিনী পূর্বে হিন্দুকুশ ও চীন সীমান্ত হইতে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে। মুহম্মদের মৃত্যুর চারি বৎসর পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশ, উত্তরে আর্মেনিয়া ও দক্ষিণে মিশর আরব অধিকারে আসে। সিসিলি, সাইপ্রাস প্রভৃতি দ্বীপও তাহারা জয় করে এবং কয়েকবার কনস্টান্টিনোপলও অবরোধ করে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় এক যুদ্ধে পারস্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং সমগ্র পারস্য আরবদের অধিকারভুক্ত হয়। অপরদিকে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আরবরা বার্বার ও মুরজাতীয়দের পরাজিত করে এবং জিব্রালটার প্রণালী পার হইয়া অষ্টম শতাব্দীর প্রথমেই স্পেন অধিকার করে (৭১১-২০ খ্রীঃ)। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস মার্টেলের রণনৈপুণ্যে আরবরা ফ্রান্সে সুবিধা করিতে পারে নাই (৭৩২ খ্রীঃ)। এইভাবে এক শতাব্দীর মধ্যে আরবরা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল।

(ঙ) **উম্মায়াদ খলিফাগণ :** মদিনায় একটি গোঁড়া দলের চক্রান্তে তৃতীয় খলিফা ওসমান নিহত হইলে মুহম্মদের জামাতা আলি খলিফা হন। পরে আলিরও এক আতায়ীর হাতে মৃত্যু হয়।

আলির পর খলিফাপদ লাভ করেন সিরিয়ার শাসনকর্তা উম্মায়াদ বংশীয় মোয়াবিয়া (৬৬১ খ্রীঃ)। কিন্তু আরবদের মধ্যে একদল মোয়াবিয়ার অধিকার স্বীকার করেন নাই, তাহারা আলির বংশধরদের খলিফাপদের ন্যায্য অধিকার মনে করিত। পরে তাহারা 'শিয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। ইহা লইয়া বহুদিন পর্যন্ত দুই দলে যুদ্ধ চলিতে থাকে। আলির দুই পুত্র ছিল—হাসান এবং হুসেন। নিরীহ প্রকৃতির হাসান মোয়াবিয়ার পক্ষে খলিফা পদের দাবি ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ খলিফা হইলে হুসেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয় ইরাকের রাজধানী কুফার নিকটে কারবালার প্রান্তরে। হুসেন তাঁহার সকল অনুচরসহ মারা যান (৬৮০ খ্রীঃ)। এই ঘটনার স্মরণে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা প্রতি বৎসর 'মহরম' মাসে একটি শোক উৎসব পালন করিয়া থাকে।

মোয়াবিয়ার সময় হইতে খলিফাপদ রাজবংশে পরিণত হয়। ইহা ইতিহাসে উম্মায়াদ বংশ নামে পরিচিত (৬৬১-৭৫০ খ্রীঃ)। এই সময়ে

মদিনা হইতে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসী বংশ নামে একটি নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আবার দামাস্কাস হইতে তাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ শহরে রাজধানী সরাইয়া লওয়া হয়। আব্বাসী বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন-অল-রসিদ (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ)। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আব্বাসীরাজ্য সেলজুক তুর্কীদের হাতে চলিয়া যায়। আব্বাসীদের যুগ আরব সাম্রাজ্যের অবনতির যুগ বলা হয়। আফ্রিকা ও স্পেন এই সময়েই খলিফার সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অপরপক্ষে আরব সভ্যতায় চরম উৎকর্ষ ও প্রসিদ্ধি এই সময়েই হইয়াছিল।

(চ) স্পেনে আরব রাজ্যঃ কর্ডোভা। স্পেনে আরব শক্তি প্রথম স্থাপিত হয় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায়। আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠার পর আব্দুর রহমান নামে একজন উম্মায়া রাজপুত্র স্পেনে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করেন। তিনি নিজেকে খলিফা বলিয়াও প্রচার করিতেন।

স্পেনে আরব রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। শহরটির আয়তনে ও লোকসংখ্যায় তখনকার বড় বড় শহরগুলির সমকক্ষ ছিল। তাহা ছাড়া কর্ডোভা ছিল শিক্ষাদীক্ষার সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নগরীর সম্পদ ও ঐশ্বর্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্পেনের মুসলমান অধিপতি সুশাসক ছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে জমিতে সেচের ও সার দিবার ব্যবস্থা হয় এবং ধান, আখ প্রভৃতি বহু প্রাচ্য দেশীয় ফসলের চাষ ইউরোপে শুরু হয়। শিল্পক্ষেত্রেও উৎকর্ষ কম হয় নাই। স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতু দ্রব্যের উপর চমৎকার নক্সা করা হইত; রেশম ও পশমের বস্ত্র, তৈয়ারীতেও কর্ডোভার তাঁতিরা বিখ্যাত ছিল। চর্মশিল্প, তরবারি, বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেও কর্ডোভা ও টলেডোর কারিগরদের সুখ্যাতি ছিল।

মুসলমান আমলে স্পেনের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল শিক্ষাব্যবস্থা। পশ্চিম ইউরোপে যখন কেবল যাজকশ্রেণীদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল, স্পেনে তখন সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার ছিল অবারিত। কর্ডোভা এবং অন্যান্য স্থানের বড় বড় মসজিদের অঙ্গ হিসাবে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে নানাদেশ হইতে ছাত্র ও শিক্ষকের সমাগম হইত। এইভাবে স্পেনের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি হইতে নূতন ভাবধারা ও নূতন নূতন বিষয়ের চর্চার প্রবর্তন হয় প্যারিস, অক্সফোর্ড প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে।

(ছ) **সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরবদের অবদান :** আরব সভ্যতা বলিয়া যাহা পরিচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ হইতে সংগৃহীত আরবদের নিজস্ব বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা হইলে আরবদের কৃতিত্ব কি ছিল? প্রথমতঃ, তাহাদের উৎসাহ ব্যতীত প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির অনেক কিছুই পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত, যেমন—গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের সভ্যতার আলোক আরবদের মাধ্যমেই পশ্চিম ইউরোপে পেঁছিয়া আধুনিক যুগের সূচনা করিয়াছিল।

কর্ডোভার মসজিদ (স্পেন)

বিশ্বের কাছে আরবদের দান তাহাদের শিক্ষানুরাগ। তাহাদের সাম্রাজ্যে যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল তাহাই পরে ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে আরবদের কয়েকটি অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১, ২, ৩, হইতে 0 পর্যন্ত অংক লিখন প্রণালী তাহারাই ইউরোপকে শিখায়, যদিচ এই অংকবিদ্যা, দশমিকের নিয়ম ও বীজগণিত তাহারা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল ও নিজেদের প্রতিভাবলে বহু নূতন তত্ত্বেরও যোগ করিয়াছিল। জ্যামিতি তাহারা গ্রীক-দের (ইউক্লিড) নিকট হইতে সংগ্রহ করে। জ্যোতির্বিদ্যা তাহারা গ্রহণ করে ভারতবর্ষ হইতে, কিন্তু ঐ বিষয়ে আরও অনেক চর্চা করিয়াছিলেন আরবীয় পণ্ডিতগণ। চিকিৎসাশাস্ত্র তাহারা শিক্ষা করে ভারতীয়দের নিকটে, কিন্তু পরে তাহাদের চেষ্টাতেই ইউরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসার প্রচলন হয়।
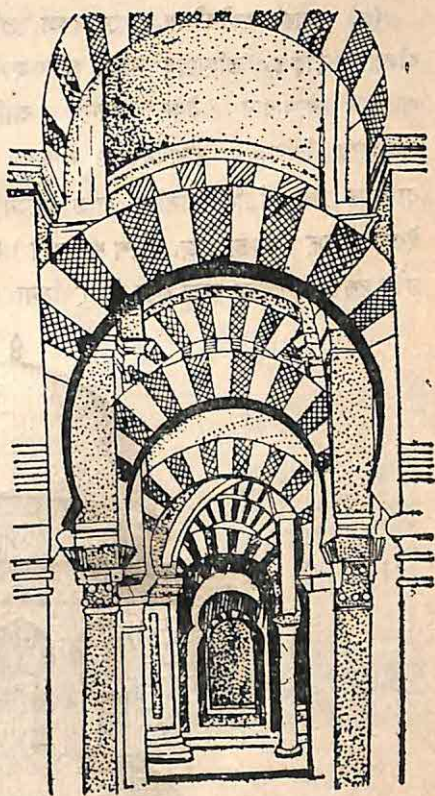
পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রেও আরবরা অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। আরবদের আর একটি মূল্যবান অবদান কাগজ প্রস্তুত করবার প্রণালী। ইহা তাহারা চীন হইতে শিখিয়া ইউরোপে প্রবর্তন করে। ইউরোপের আখের চাষ এবং আখ হইতে চিনি তৈয়ারী করিবার পদ্ধতি ও নানারকম ফল ও ফুলের চাষ শিখায় আরবরা।

(জ) **আরব মনীষীগণ :** যে সকল প্রতিভাধর আরব পণ্ডিত, জগদ্বরেণ্য বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের কীর্তিকথা আলোচনা করা যাইতে পারে। বুখারার ইবন্ সিনা (আভিসেন্না, দশম শতাব্দী) ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক ও কবি। অ্যারিস্টট্‌ল ও প্লেটোর দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখার জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আর একজন দার্শনিক ছিলেন ইবন্ রুস্‌দ্ (আভারোজ, দ্বাদশ শতাব্দী)। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের ইউরোপ গ্রীক দর্শনের পরিচয় লাভ করে ইবন্ সিনা ও ইবন্‌রুসদ-এর লেখা হইতে।
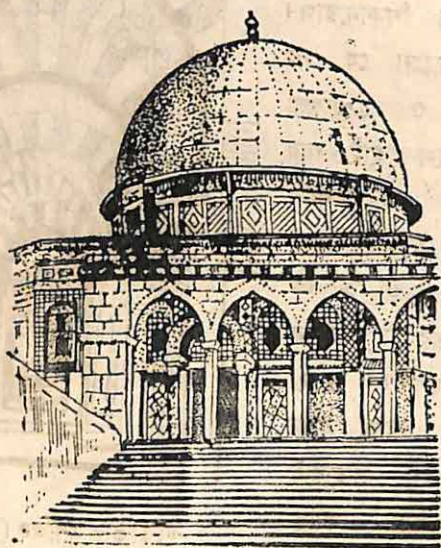
ডোম্ অফ দি রক্ (জেরুসালেম)

ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে দুইজন পণ্ডিত বিখ্যাত ছিলেন—পারস্যের আল্‌তাবারি (নবম শতাব্দী) ও উত্তর আফ্রিকার ইবন খালদুন্ (চতুর্দশ শতাব্দী)। আলতাবারি রচনা করেন একখানি বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থ আর ইবন্ খালদুন্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস লেখার ধারা প্রবর্তন করেন। ভারতীয় সভ্যতার মহিমা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন আল বিরুনী

(দশম শতাব্দী)। গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সময়ে তিনি এই দেশে আসেন ও সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া বহু পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার লিখিত 'ভারত বিবরণ' ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান।

ট্যাঞ্জিয়ারের (উত্তর আফ্রিকার) বিখ্যাত মুসলমান পর্যটক ইবনবতুতা (চতুর্দশ শতাব্দী) মুহম্মদ তুঘলকের সময় ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে সেই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

আরব সাম্রাজ্যে স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাইজান্টাইন ও পারসিক স্থাপত্য-রীতির প্রভাবে আরব স্থাপত্য-শৈলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার বিশেষত্ব ছিল—গোল গম্বুজ, উচ্চ মিনার এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি খিলান। আরব শিল্পীরা মানুষ অথবা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দিতে পারিত না, তবে জ্যামিতিক নক্সা, রেখা ও লতাপাতার কারুকার্য দিয়া তাহারা দেওয়াল অলঙ্কৃত করিত। এই রকম নক্সাকে ইউরোপীয় ভাষায় বলা হয় 'আরাবেস্ক' (Arabesque)। উম্মায়াদ যুগ ছিল আরব স্থাপত্য শিল্পের গৌরবময় যুগ। এই সময়কার দুইটি মসজিদ তাহার নিদর্শন—একটি জেরুসালেমের 'ডোম অফ দি রক' (Dome of the Rock) ও অপরটি দামাস্কাসের বড় মসজিদ। স্পেনে মুসলমান স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ কর্ডোভার বড় মসজিদ ও গ্রানাডার রাজপ্রাসাদ বা আলহামরা (লালকেল্লা)।
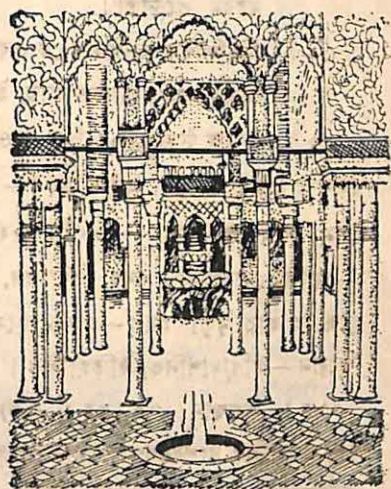
আলহাম্‌রা প্রাসাদ (স্পেন)

অনুশীলনী

১। বেদুইন কাহারা ছিল? বেদুইনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কি জান

২। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে? সংক্ষেপে তাহার জীবনী লিখ।

৩। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরবদের ধর্ম কিরূপ ছিল? ইসলাম ধর্মের সার কথা কি? কোন্ গ্রন্থে উহা লেখা আছে?

৪। মুহম্মদের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য কিভাবে গড়িয়া উঠিল ? এই সাফল্যের কারণ কি ?

৫। খলিফাপদ কিভাবে সৃষ্টি হয় ? 'ধর্মপ্রাণ খলিফা' কাহাদের বলা হইত ?

৬। হাসান এবং হুসেন কে ছিলেন ? কারবালার যুদ্ধ কেন হইয়াছিল ? তাহার পরিণতি কি হয় ?

৭। স্পেনে আরব রাজ্য কিভাবে গড়িয়া উঠে ? রাজধানীর নাম কি ? সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

৮। আরব স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শনের নাম কি ?

৯। বিশ্বসভ্যতায় আরবদের অবদান সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

১০। সংক্ষেপে লিখ :—কাবা, কুর্-আন্, হিজিরা, অ্যারাবেস্ক, মোয়াবিয়া, মহরম, কর্ডোভা।

১১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কে এবং কি জন্য বিখ্যাত ছিলেন ? আবু সিনা ইবন রুস্দ্, আলতাবারি, ইবন্ খালদুন, আলবিরুনী ও ইবন্ বতুতা।

১২। সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দাও : (ক) যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কত পরে ইসলাম ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল ?—১০০০/৬০০ বৎসর (খ) হিজিরা সাল গণনা কবে শুরু হয় ?—৭৮০খ্রীঃ/৬২২খ্রীঃ (গ) 'ধর্মপ্রাণ খলিফা কাহারা ছিলেন ? —আলি, মোয়াবিয়া, ওমর, ইয়াজিদ, ওসমান, আবুবকর। (ঘ) কারবালার যুদ্ধে কাহার মৃত্যু হয় ?—হাসান/হুসেন (ঙ) আল্তাবারি ও ইবন্ খালদুন্ ছিলেন—কবি/দার্শনিক/ঐতিহাসিক।

১৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(ক) —খ্রীাব্দে মুহম্মদের দেহাবসন হয়। (খ) আলির বংশধরগণ পরে—সম্প্রদায় নামে পরিচত হয়। (গ) উম্মায়াদ খলিফাদের সময়ে রাজধানী—হইতে—স্থানান্তরিত হয়। (ঘ) স্পেনে আরব রাজ্যের রাজধানী ছিল —।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ (৮০০—১২০০ খ্রীঃ)

(ক) **ফ্রাঙ্ক রাজ্য ও শার্লমান :** পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগে কয়েকটি নূতন জার্মান রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা তোমরা পড়িয়াছ। তাহাদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক ফ্রান্স ও জার্মানীর কিয়দংশ জুড়িয়া ছিল ফ্রাঙ্ক জাতির রাজ্য। এই অঞ্চলের নাম ছিল 'গল' প্রদেশ। বর্তমানে ঐ দেশের নাম হইয়াছে ফ্রান্স।

ফ্রাঙ্কদের প্রথম খ্যাতনামা রাজা ছিলেন ক্লোভিস (৪৮১-৫১১ খ্রীঃ)। জার্মান জাতির অন্যান্য কয়েকটি শাখাকে পরাজিত করিয়া তিনি ফ্রাঙ্ক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের সাহায্য পাইবার আশায় তিনি সদলে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার রাজ্যে ল্যাটিন ভাষা ও রোমান আইন-কানুনের পুনঃ প্রচলন করেন।

শার্লমান

শার্লমান : অষ্টম শতাব্দীতে ক্লোভিসের বংশধরগণের অকর্মণ্যতার ফলে মেরোভিঞ্জিয়ান ফ্রাঙ্ক রাজত্বের অবসান হয় এবং একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে তাহাদের বলা হয় ক্যারোলিঙ্গিয়ান (Carolingian) বংশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন শার্লমান (Charlemagne)। ফরাসী শব্দ 'শার্লমান' এর অর্থ মহামতি চার্লস বা (Charles the Great)। শার্লমান ৭৬৮ হইতে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের খলিফা হারুণ অল-রশিদের সমসাময়িক। দুজনের সম্পর্কও ছিল বন্ধুত্বের। শার্লমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও জীবনীকার আইনহার্ডের বর্ণনায় জানা যায় যে তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় সুস্বাস্থ্যবান। তাঁহার ছিল দীর্ঘ নাসিকা ও উজ্জ্বল চক্ষু। সিংহের মত সাহস ও অমানুষিক শক্তির অধিকারী শার্লমান ঘোড়ায় চড়িতে ও সাঁতার কাটিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি সর্বদা ফ্রাঙ্কদের জাতীয় পোশাক পরিতেন, উৎসব উপলক্ষে ধারণ করিতেন মুকুট ও মণিমুক্তা-খচিত তরবারি। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেন। ল্যাটিন ভাষা ও রোমান সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন শার্লমান, কিন্তু কথাবার্তা বলিতেন জার্মান ভাষায়।

রাজ্যবিস্তার : মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন শার্লমান। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হয়। প্রায় পঞ্চাশটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন। প্রথমে রোমের পোপকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি

ইটালীতে লাম্বার্ডদের পরাজিত করেন। তাহার ফলে ইটালীতে ফ্রাঙ্ক শক্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর তিনি স্পেনে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। উমায়াদ বংশীয় আরব শাসনকর্তা পীরেনীজ পর্বতের দক্ষিণে

একটি জেলা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে পীরেনীজের একটি গিরিপথে শার্লমানের একটি সৈন্যদল শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হয়। সেই ঘটনা অবলম্বনে প্রায় তিনশত বৎসর পরে ফরাসী ভাষায় রচিত হয় প্রসিদ্ধ চারণগীত "সাঁজো দ্য রোলাঁ"। রোলাঁ ছিলেন বাহিনীর নায়ক, তাহারই বীরত্বের কাহিনী এই গীতিকাব্য।

শার্লমানের প্রধান সামরিক কৃতিত্ব উত্তর ও পূর্বে স্যাক্সন ও অন্যান্য জার্মানদের দমন করা। সেজন্য তাহাকে বহুবার অভিযান পাঠাইতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা তাহাঁর বশ্যতা স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। শার্লমানের উদ্দেশ্যই ছিল তাহাদের সুসভ্য খ্রীষ্টান করিয়া তোলা। তাহা ছাড়া তিনি পূর্ব ইউরোপে আভার শ্লাভ ও হাঙ্গেরীর ম্যাগিয়ারদের (মঙ্গোল জাতির একটি শাখা), আক্রমণ প্রতিহত করেন। এইভাবে পূর্বে ওডার নদী হইতে পশ্চিমে এব্রো নদী পর্যন্ত, উত্তরে সমুদ্র উপকূল হইতে দক্ষিণে ইটালীর উত্তরাংশ এবং স্পেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় শার্লমানের বিরাট সাম্রাজ্য।

শার্লমানের সম্রাটপদে অভিষেক : শার্লমানের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা পোপ তৃতীয় লিও কর্তৃক রোমের সম্রাটরূপে তাঁহার অভিষেক। লাম্বার্ড উৎপদ্রব হইতে পোপের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন শার্লমান। তখন হইতে তিনি চার্চের রক্ষাকর্তা হইয়া উঠেন। ৮০০ খ্রীস্টাব্দে পোপ তৃতীও লিওর বিরুদ্ধে রোমের অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ হইলে তিনি শার্লমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শার্লমানও স্বয়ং রোমে আসিয়া লিওকে রক্ষা করেন। তাহার কয়েকদিন পরে যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনে (Christmas) রোমের বিখ্যাত সেন্ট পিটার গির্জায় উপাসনা করিতে যান শার্লমান। সেই সময়ে অকস্মাৎ পোপ লিও তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দেন ও রোমের সম্রাটপদে বরণ করেন। উপস্থিত যাজকমণ্ডলী, অভিজাত নাগরিকবৃন্দ ও সেনানায়কগণ সকলে রোম সম্রাট শার্লমানের জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। এইভাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের তিন শতাব্দী পর সেই পুরাতন সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হয় পোপ লিওর চেষ্টায়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বাইজান্টাইন সম্রাটের অধীনতা-মুক্ত হইতে এবং পোপের ক্ষমতা যে সম্রাটেরও ঊর্ধে তাহা দেখাইতে। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ইহা পূর্বের সাম্রাজ্যের নতুন রূপ মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল নূতন সৃষ্টি; রোমের নাম ও সাম্রাজ্যের আদর্শ ছাড়া পুরাতনের আর কিছুই ছিল না।

শার্লমান ছিলেন খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যেখানেই তিনি রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন সেইখানেই খৃষ্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্যাক্সনদের খ্রীষ্টান করা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব। তাহাদের জন্য তিনি বহু মঠ ও গির্জা এবং বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেন। শার্লমান তাঁহার সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন খ্রীষ্টধর্মের নামে। এইজন্য তাঁহার সাম্রাজ্য 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' (Holy Roman Empire) আখ্যা লাভ করে।

শিল্পানুরাগ ও শিক্ষাবিস্তার : শার্লমানের রাজধানী ছিল রাইন নদের তীরে আকেন (Aachen) নগরী। রোমের গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মরণে তাহার নাম হয় 'নতুন রোম'। এখানে তিনি একটি চমৎকার প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণ করান। তাহার ভিতর সোনা, রূপা প্রভৃতির সাজসজ্জা ছিল এবং মাঝখানে গম্বুজ ছিল মোজাইক ছবি।

লেখাপড়া শেখা ও শেখানর প্রতি শার্লমানের ছিল গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ। তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক পড়িতে পারিতেন মাতৃভাষা জার্মান তাঁহার ভালই জানা ছিল; কিন্তু তিনি লিখিতে জানিতেন না। এজন্য অবশ্য তাঁহার চেষ্টার অভাব ছিল না। শোনা যায়, তিনি লিখিবার সরঞ্জাম বালিশের নীচে রাখিয়া শুইতেন, যাহাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই লেখা অভ্যাস করিতে পারেন।

রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এমন কি রাজ-পরিবারের বিদ্যার্থীদের জন্য প্রাসাদেই পাঠকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনি। নিজের রাজ্যে বিদ্বান পণ্ডিতের অভাব ছিল। সেইজন্য অন্যান্য দেশ হইতে শিক্ষক আনাইয়াছিলেন। যেমন, ইটালী হইতে ঐতিহাসিক পল, পিসা হইতে পিটার ভাষাতাত্ত্বিক। স্পেন হইতে মনীষী থিওডালফ প্রভৃতি। তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন ইংলন্ড হইতে আগত মহাপণ্ডিত আলকুইন; প্রথমে প্রাসাদের বিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করিতেন আলকুইন এবং সম্রাট স্বয়ং তাঁহার ছাত্র হন। পরে তিনি একটা মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও সেখানেও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শার্লমানের চেষ্টায় বহু মঠেই তখন বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে! শিক্ষাবিস্তারের ফলে ল্যাটিন হইয়া উঠে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাষা ও পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার গৌরব আবার ছড়াইয়া পড়ে।

চার্চের সহিত সম্রাটের সম্পর্ক : শার্লমানের জীবদ্দশায় পোপের সহিত তাঁহার প্রকাশ্যে বিরোধ ঘটে নাই। যদিচ সম্রাট চাহিতেন পোপের উপর কর্তৃত্ব করিতে, আর পোপ চাহিতেন ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে সম্রাটের

উপর কর্তৃত্ব করিতে। এইজন্য দেখা যায় যে, শার্লমান তাঁহার পুত্রের অভিষেক নিজহস্তে প্রাসাদেই সম্পন্ন করেন। যাহা হউক, শার্লমানের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্বাংশ বর্তমান জার্মানী ও পশ্চিম ফ্রান্স ক্রমে পৃথক ভাষাভাষী দুইটি জাতি হইয়া উঠে। পূর্বাঞ্চলের রাজা অটো ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ কর্তৃক আবার 'রোম-সম্রাট'-রূপে অভিষিক্ত হন। যদিচ ইহা ছিল শুধু জার্মান সাম্রাজ্য। ইহাই পরবর্তীকালে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু অটোর সময় হইতে প্রায় তিন শত বৎসর সম্রাট ও পোপের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ চলিয়াছিল।

(খ) মধ্যযুগের গির্জা ও মঠ ঃ মধ্যযুগের সমাজে খ্রীষ্টান মঠ ও বিহারগুলির অবদান অসামান্য। মঠগুলির অধিবাসীদের বলা হইত যাজক। অবশ্য যাজক বলিতে কেবলমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায় বুঝাইত না, লেখাপড়ার
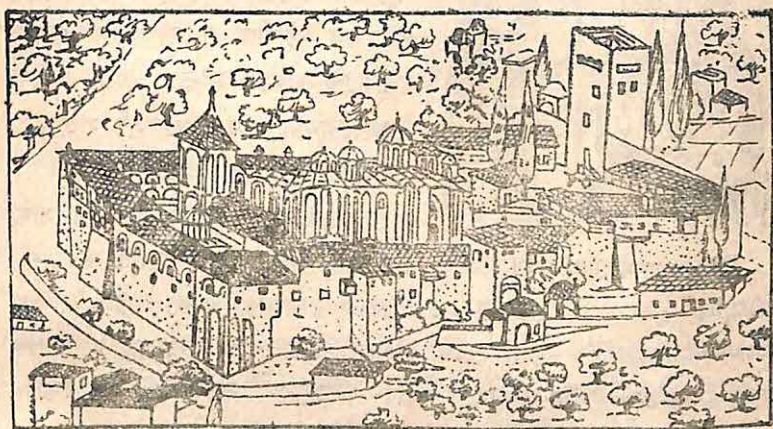
খ্রীষ্টান মঠ (Monastery)

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, অধ্যাপক, লিপিকার, দার্শনিক সকলকেই যাজকশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইত। পুরোহিত যাজকরা অবিবাহিত থাকিতেন, জীবিকার জন্য অন্য কোন কাজকর্ম করা তাঁহাদের নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহাদের পরনে থাকিত গলা হইতে বোতাম দেওয়া একটি লম্বা আলখাল্লার মত পোশাক এবং তাঁহাদের মাথার মাঝখানে খানিকটা চুল কামাইয়া ফেলা হইত।

যাজকদের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটি শ্রেণী ছিল—সাধারণ যাজক ও মঠবাসী যাজক (monk)। পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন 'পোপ'।

তাঁহার অধীনে বিভিন্ন দেশে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ধর্মযাজক বা 'বিশপ'। কোন কোন বড় এলাকাতে থাকিতেন একজন 'আর্চ বিশপ'। প্রত্যেক বিশপীয় বিভাগ আবার ছোট এলাকায় ভাগ করা হইত, তাহাদের বলা হইত 'প্যারিশ'। গ্রাম্য সমাজের কেন্দ্র ছিল প্যারিশ গীর্জা। প্যারিশের যাজক গ্রামবাসীদের সহিত মেলামেশা করিতেন ও আহাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

আর একদল যাজক ছিলেন তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপনের জন্য কোন নির্জন স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া একান্তে ভগবানের আরাধনা করিতেন। এইরকম একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সাধু বেনিডিক্ট, নেপলসের নিকটে ক্যাসিনো পাহাড়ের উপর। এই-রূপ বহু মঠ বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক মঠ ছিল। প্রতি মঠে মঠাধ্যক্ষ বা মঠাধ্যক্ষার শাসনে যাজকদের চলিতে হইত। কোন নির্দিষ্ট নিয়মকানুন না থাকায় মঠবাসী যাজকদের মধ্যে ছিল শৃঙ্খলার অভাব। যাজকদের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা প্রবর্তনের জন্য সাধু বেনেডিক্ট প্রণয়ন করেন তিনটি উপদেশ।

খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী (monk)

সেইগুলি হইয়া উঠে ব্রতের মত প্রত্যেক যাজকের অবশ্য পালনীয় ধর্ম (Benedictine Vows)। যেমন চরিত্রের পবিত্রতা ও জনসেবা, মঠাধ্যক্ষের আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিরহঙ্কার অর্থাৎ নিজেকে ভগবানের ও গির্জার সেবক মনে করা। মঠবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বেশ কঠোর ছিল। অতি প্রত্যূষকাল হইতে নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থনা, লেখাপড়া ও অধ্যাপনা এবং জনসেবার কাজ তাঁহাদের করিতে হইত। মধ্যযুগের শিক্ষাদীক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন এই যাজক সম্প্রদায়। মঠের সাধু ছাড়া আর এক প্রকার ভ্রাম্যমান যাজকদল ছিল। তাঁহাদের বলা হইত ফ্রায়ার (Friar) বা ভ্রাতা। তাঁহারাও ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, সাধারণ লোকের সেবা ছিল তাঁহাদের ব্রত। স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জন করিলেও বিদ্যার্থীকে শিক্ষাদানে তাঁহারা ছিলেন সদা তৎপর। মধ্যযুগের মনীষীদের অনেকেই ছিলেন ফ্রায়ার।

বেনিডিক্টাইন যাজক সঙ্ঘের মত দশম শতাব্দীতে বারগাণ্ডীতে ক্লুনি মঠে গড়িয়া উঠে আর একটি সঙ্ঘ। যাজক সম্প্রদায়ের নিয়মকানুনের অনেক সংস্কার সাধন করেন ক্লুনির মঠাধ্যক্ষ। এই সময়েই স্থির হয় যে, ক্লুনি সম্প্রদায়ের সকল গির্জা ও মঠ পরিচালিত হইবে একমাত্র কেন্দ্রীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দেশে এবং সেই-গুলির উপরে সরকারী বা সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ব চলিবে না। তাহা ছাড়া মঠগুলির নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। এইসব সংস্কারের ফলে মঠগুলি সত্যসত্যই জনকল্যাণকারী সংস্থা হইয়া উঠে।

ফ্রায়ার সন্ন্যাসী

(গ) মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় (১১শ—১২শ শতাব্দী)ঃ মধ্য যুগের প্রথমদিকে বিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠে গির্জা বা ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন মন্দিরে, শিক্ষকগণের সকলেই ছিলেন যাজক। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে নাগরিকদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বাড়িতে থাকে এবং গির্জার বাহিরেও বহু বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। এইসব বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের পঠন-পাঠন হইত না, অনেক নূতন নূতন বিষয়ের চর্চাও হইত, যেমন—রোমান আইন, দর্শন, বিজ্ঞান, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র।

এইসব বিদ্যালয়ে কোন আড়ম্বর ছিল না। শিক্ষক ও ছাত্রদের আগ্রহ ও নিষ্ঠাই ছিল বিদ্যালয়ের বুনিয়াদ। যেখানেই শিক্ষক ও ছাত্রদের বাসোপ-যোগী জায়গা পাওয়া যাইত সেখানেই বিদ্যালয়ের কাজ চলিত। শিক্ষকের সামান্য পারিশ্রমিকও ছাত্ররা সংগ্রহ করিত। নামী অধ্যাপকদের নিকট পড়িবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে ছাত্র সমাগম হইত বলিয়া ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত হয়।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয় একাদশ শতাব্দী হইতে। ইটালীর বোলোনা (Bologna) নগরের বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপের সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়

বলিয়া পরিচিত। রোমান আইন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে বোলোনা বিখ্যাত ছিল। পরে বোলোনার আদর্শে ইটালীর অন্যান্য নগরে আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইরূপ শালের্নো বিশ্ববিদ্যালয়ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ও অত্যন্ত প্রাচীন ; বোলোনার সমসাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। ইহার খ্যাতি ছিল প্রধানতঃ খ্রীষ্টান ধর্ম ও দর্শন শিক্ষার জন্য। ইংলণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

মধ্যযুগের মনীষী বা স্কলাষ্টিক্স্ (Scholastics, Schoolmen)--শার্লমানের সময় হইতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয় পরবর্তীকালে তাহা শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন উদ্যম ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। তাহার মুখ্য কারণ প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের অধ্যয়ন আরবদের চেষ্টায় ইউরোপে আবার প্রচলিত হয়। মধ্যযুগের পণ্ডিতরাও অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে সবকিছু যুক্তি দিয়া পরীক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন।

মধ্যযুগের মনীষীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা, ফরাসী পণ্ডিত পিটার আবেলার্ড (১০৭৯—১১৪২ খ্রীঃ), জার্মান দার্শনিক

আবেলার্ড

অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্নাস

অ্যালবার্টাস্ ম্যাগনাস্ (১২০১—৮০ খ্রীঃ) ও তাঁহার শিষ্য টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫—৭৪ খ্রীঃ) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রজার বেকন (১২১৪—৯২ খ্রীঃ)।

আবেলার্ড ধনীর সন্তান হইয়াও শিক্ষক ও ধর্মযাজকদের জীবন বরণ করেন কেবল জ্ঞানান্বেষণের জন্য। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী। খৃষ্টান ধর্মের অনেক আচার-বিচার অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়া, যুক্তি-তর্কের দ্বারা সত্যধর্ম স্থাপনের চেষ্টার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হন। অ্যালবার্টাস্ ম্যাগ্নাসও ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক। টমাস অ্যাকুইনাস ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁহার সহিত তর্কে কেহই পারিত না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তখনকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার বেকন। তিনি গ্রীক, আরবী প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আবার চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রেও ছিল তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। ছোট জিনিসকে বড় দেখাইবার জন্য অণুবীক্ষণ কাঁচ তাঁহারই আবিষ্কার। বারুদ তৈয়ারীর প্রণালী তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন।

টমাস অ্যাকুইনাস
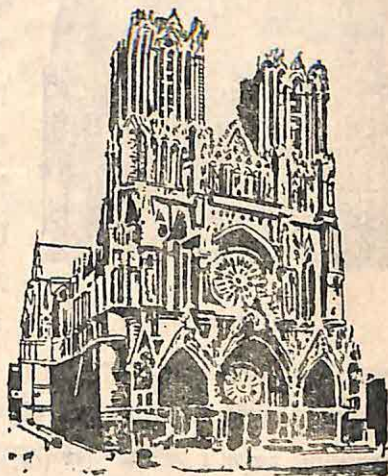
নোত্রদাম গির্জা

মধ্যযুগের আর একটি অবদান লৌকিক ভাষার বিকাশ; যেমন, ইংরাজী, জার্মান, ফরাসী, স্প্যানিস্, ইটালীয়ান প্রভৃতি। পূর্বে ল্যাটিন ছিল পণ্ডিতদের ভাষা, গির্জাতেই হইত ল্যাটিনের ব্যবহার। সাধারণ লোকের চলিত ভাষার কোন কদর ছিল না। চারণকবিদের গীতিকাব্যের অবাধ প্রচলন ও জনপ্রিয়তার ফলে বিভিন্ন দেশে লৌকিক ভাষার বিকাশ ও প্রসার ঘটে। ইংলণ্ডে 'রবিনহুড ও রাজা আর্থারের কাহিনী', ফ্রান্সে 'রোলাঁর গীত' প্রভৃতি কাব্য লৌকিক সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত। পরে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভাব হয়

—ইটালীতে মহাকবি দান্তের (১২৬৫—১৩৩১ খ্রীঃ Divine Comedy) ও ইংলণ্ডে চসারের (১৩৪০—১৪০০ খ্রীঃ Canterbury Tales)। কাব্যগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলিয়া আজও সমাদৃত।

স্থাপত্যশিল্পে এক অভিনব রীতির প্রচলন হয় মধ্যযুগে। দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বড় বড় ক্যাথিড্রাল গির্জা নির্মিত হইয়াছিল এই নূতন শৈলীতে। এই ধরনের গৃহ নির্মাণকে 'গথিক' শিল্প বলা হয়, যদিও গথ জাতির সহিত এই শিল্পকলার কোন সম্বন্ধ ছিল না। মনে হয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির প্রয়োগ করা হয় বলিয়া গথিক নামকরণ হইয়াছিল। এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য হইল গির্জার শিখরগুলি ক্রমশঃ সরু হইয়া সোজা আকাশের দিকে উঠিয়াছে এবং খিলানগুলি অর্ধচন্দ্রাকারের বদলে ত্রিকোণাকৃতি। ভিতর দিক হইতে দেখিলে মনে হইবে যেন কোন নৌকা বা জাহাজ উল্টা করিয়া বসান আছে। চারিদিকের দেওয়ালে খোদাই করা মূর্তি ও মুরাল চিত্রের অপূর্ব সমাবেশ, এমনকি জানালাগুলির রঙিন কাঁচের উপরও নানারকম ছবি ও আলপনার নক্সা। গথিক শিল্প-রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ফ্রান্সে রাইমস্ ক্যাথিড্রাল ও প্যারিসের নোতরদাম গির্জা, ইটালীতে মিলান ক্যাথিড্রাল ও ইংলণ্ডের ক্যান্টারবারী গির্জা। কলিকাতার হাইকোর্ট বাড়ীটিও গথিক শিল্পের নমুনা।
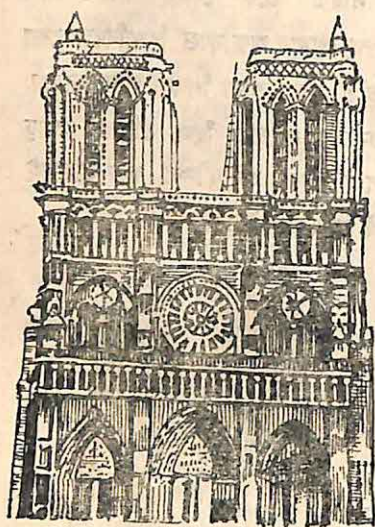
রাইম্স্ ক্যাথিড্রাল

অনুশীলনী

১। শার্লমান কে ছিলেন? তিনি কতদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন?

২। শার্লমানের অভিষেক কাহিনী বর্ণনা কর। পোপ কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেন?

৩। শার্লমানের চরিত্র, বিদ্যানুরাগ ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৪। মধ্যযুগের সভ্যতা বিস্তারে খ্রীষ্টান মঠ ও গির্জাগুলির অবদান কি?
৫। যাজক সম্প্রদায় কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? মঠবাসী যাজকদের সঙ্ঘবদ্ধ কে করেন? তাঁহাদের কি কি ব্রত পালন করিতে হইত?
৬। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল? ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তখন কেমন ছিল? ঐ যুগের কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।
৭। মধ্যযুগে ইউরোপের চিন্তাজগতে কিভাবে নূতন উদ্দীপনা জাগিয়াছিল? সে সময়কার কয়েকজন মনীষীর নাম কর।
৮। লৌকিক ভাষা ও সাহিত্য কিভাবে গড়িয়া উঠে? দান্তে ও চসার কে ছিলেন? গথিক শিল্প কাহাকে বলে?
৯। সংক্ষেপে লিখ: ক্লোভিস, সাঁজো দ্য রোলাঁ, পবিত্র রোম সাম্রাজ্য, আকেন, আল্‌কুইন, সাধু বেনিডিক্ট, ফ্রায়ার, ক্লুনি, স্কলাষ্টিক্‌স্ বা স্কুলমেন্।
১০। সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দাও—(ক) শার্লমান ছিলেন—মেরোভিঞ্জিয়ান/ক্যারোলিঙ্গিয়ান। (খ) শার্লমান কাহার ছাত্র হন—পল/পিটার/আল্‌কুইন। (গ) গথিক স্থাপত্য উদ্ভাবন করেন গথ্‌রা—হাঁ/না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্তপ্রথা

(ক) **সামন্তপ্রথা** (ফিউডালিস্‌ম্): মধ্যযুগে ইউরোপে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল সামন্তপ্রথা, ইংরাজীতে যাহাকে 'ফিউডালিস্‌ম্' (feudalism) বলা হয়। ফিউডালিস্‌ম্ কথাটি আবার ল্যাটিন শব্দ 'ফিওডাম' (feodum) হইতে উৎপন্ন। যাহার অর্থ জোত বা জমিজমার মালিকানা। সেইজন্য সমান্তপ্রথা গড়িয়া উঠিয়াছিল জমির মালিকানা ও রাজার সহিত জোতদারদের সম্পর্ক কেন্দ্র করিয়া। তাহার ভিত্তিতে সমস্ত সমাজ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল। সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন দেশের রাজা, তিনিই ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। তিনি কিছু জমি নিজের খাসদখলে রাখিয়া বাকী অংশ অভিজাত সামন্তদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন, তাহাদের

বলা হইত মুখ্য সামন্ত বা জমিদার (chief tenants)। ইহার পরিবর্তে মুখ্য সামন্তগণ রাজাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং সামরিক সাহায্য ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিতেন। মুখ সামন্তগণ আবার কিছু জমি খাসদখলে রাখিয়া বাকী অংশ নিম্ন সামন্তদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন, পূর্বের মত একই শর্তে। নিম্ন সামন্তদের বলা হইত mesne tenants। এইভাবে জমি সমাজের উচ্চতম স্তর হইতে মধ্য নিম্ন স্তরের মধ্যে বণ্টিত হইতে হইতে সর্বনিম্ন স্তরে চাষীদের হাতে পৌঁছিত। এই চাষীদের বলা হইত সার্ফ বা ভিলেন্ (serf or villein)।

ফিউডালিস্‌ম বলিতে শুধু জোতজমার মালিকানা বুঝাইত না, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক শাসনাধিকারও বুঝাইত। ফিউডালিস্‌ম্ ছিল তখনকার শাসনব্যবস্থার অঙ্গ। পূর্বে রাষ্ট্র ছিল রাজার শাসনাধীন, রাষ্ট্ররক্ষা ছিল রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য। নূতন ব্যবস্থায় নীতিগত ভাবে রাজা সকল জমির মালিক ও রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হইলেও, তাঁহার খাসদখলের জমি বা অঞ্চল ছাড়া তাঁহার কর্তৃত্ব খাটিত না। বিভিন্ন মুখ্য সামন্তগণ বিভিন্ন অঞ্চলের কর্তা হইয়াছেন রাজারই নির্দেশে। পূর্বে সেই সকল অঞ্চল শাসন করিতেন ডিউক্, কাউন্ট, ভাইকাউন্ট প্রভৃতি অভিজাত রাজকর্মচারী। এখন তাঁহারাই মুখ্য সামান্ত হিসাবে হইয়া উঠিলেন প্রায় স্বাধীন আঞ্চলিক শাসনকর্তা। তাঁহারাই করিতেন নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব ও শুল্ক আদায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারও ছিল তাঁহাদের হাতে। এককথায়, রাজকীয় শাসনের পরিবর্তে প্রচলিত হয় বেসরকারী স্বায়ত্তশাসন কেবলমাত্র রাজার প্রতি আনুগত্য ও যুদ্ধ বা অভিযানে সৈন্য দিয়া সাহায্যের বিনিময়ে।

(খ) **ফিউডাল দুর্গ**ঃ সামন্তদের মধ্যে ছোট-বড় নানা মর্যাদার লোক ছিল। মুখ্য সামন্তদের সাধারণতঃ বলা হইত প্রভু বা লর্ড (lord) এবং তাঁহার অধস্তনরা ভ্যাসাল (vassal)। ভূ-সম্পদের তারতম্য অনুযায়ী নির্মিত হইত তাঁহাদের বাসগৃহ, কোনটি আকারে বিশাল প্রাসাদের মত, কোনটি আবার দুর্গের মত পাহাড়ের উপরে বা কোন উচ্চস্থানে তৈয়ারী হইত। তাহাদের বলা হইত ক্যাস্‌ল্ (castle)। মধ্যযুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি বিশিষ্ট অবদান সামন্ত অধিপতিদের দুর্গ (feudal castles)। প্রথমদিকে দুর্গের বাসগৃহ ছিল কাঠের তৈয়ারী, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পাথরের ব্যবহার প্রচলিত হয়। দুর্গের চারিদিকে দীর্ঘ ও সুগভীর পরিখা (খাল) কাটা হইত। তাহার উপর থাকিত একটি কাঠের সেতু যাহা

এমনভাবে বসান হইত যে প্রয়োজন মত ভিতরের দিক হইতে লোহার শিকলের সাহায্যে টানিয়া লওয়া যাইত। এইজন্য ইহাকে বলা হইত টানাসেতু (draw bridge)। সেতু পার হইয়া আসিলে দুর্গের সম্মুখভাগে থাকিত তীক্ষ্ম লোহ শলাকা বসান বিরাট ও মজবুত কাঠের ফটক। এইভাবে দুর্গ হইয়া উঠিত দুর্ভেদ্য।
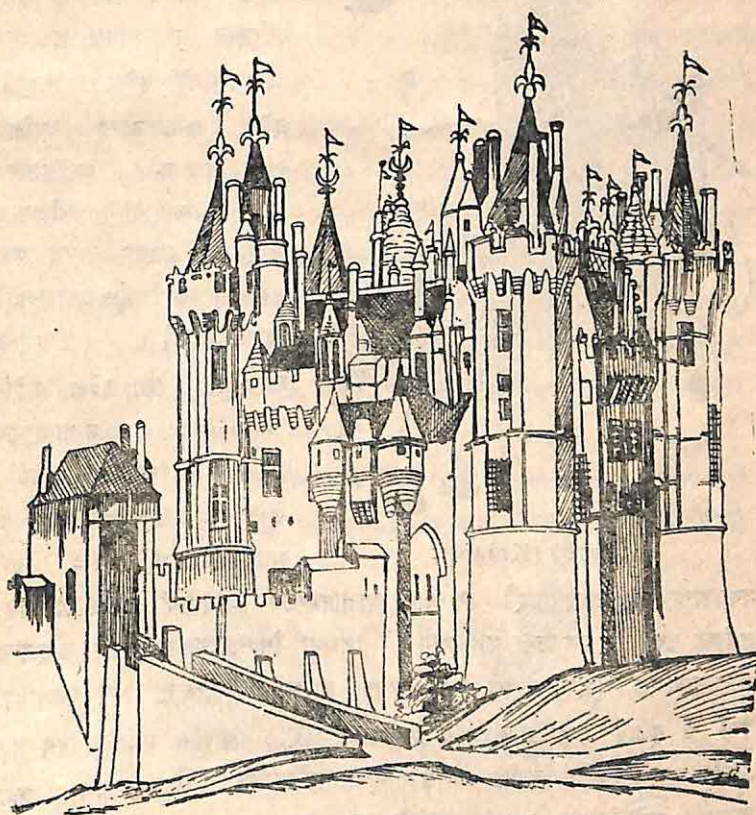
ফিউডাল দুর্গ (Castle)

দেশরক্ষার জন্য রাজার অধীনে কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না। যখনই প্রয়োজন হইত রাজা মুখ্য সামন্তদের নিকট হইতে এবং তাঁহারা আবার তাঁহাদের অধস্তন সামন্তদের নিকট হইতে সৈন্য দাবী করিতেন। সেইসব সৈন্যদলের আনুগত্য থাকিত নিজ নিজ সামন্ত দলপতির প্রতি, রাজার প্রতি নহে। ইহার ফলে সামন্তগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিত।

(গ) নাইট (Knight): শার্লমানের মৃত্যুর পর ইউরোপে আবার সংকট ঘনাইয়া আসে, উত্তরাঞ্চলের নোর্সমেন (Norsemen) ও পূর্বাঞ্চলের ম্যাগিয়ার প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণের ফলে চারিদিকে অরাজকতা বৃদ্ধি পায়। শান্তিপ্রিয় সাধারণ শ্রেণীর লোক সেই অনিশ্চয়তা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জমিদার বা সামন্ত প্রভুদের আশ্রয়প্রার্থী হইত। তাহারা হইত জমিদারদের আশ্রিত প্রজা বা সার্ফ। আশ্রিতদের মধ্যে যাহারা অভিজাত তাহাদের লইয়া গঠন করা হইত সামন্ত প্রভুর অশ্বারোহী যোদ্ধাবাহিনী। তাহাদের দলপতিকে বলা হইত 'নাইট' (Knight)। মধ্যযুগে সমাজের আদর্শ ছিল 'নাইট'। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ সবই ছিল মর্যাদাপূর্ণ। অশ্বারোহী যোদ্ধার আপাদমস্তক লৌহবর্মে এমনভাবে ঢাকা থাকিত যে তাহাকে চেনা যাইত না। সেজন্য শিরস্ত্রাণে বা ঢালে তাহাদের পরিচয়জ্ঞাপক পৃথক পৃথক চিহ্ন দেওয়া থাকিত। যুদ্ধাস্ত্র ছিল তরবারী, বর্শা ও কুঠার এবং আত্মরক্ষার জন্য গলা হইতে ঝোলান থাকিত বেশ বড় একটি ঢাল। দুর্গাধিপতি সামন্ত প্রভুগণ শক্তিবৃদ্ধি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অনুগত নাইটদিগকে দুর্গের মধ্যেই রাখিতেন। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল জটিল ও সংকটাপন্ন, বিজাতীয়দের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত। মধ্যযুগের সেই দুর্যোগের মধ্যে সামন্ত দুর্গগুলি এবং বীরবিক্রমী নাইট যোদ্ধাগণ ছিল সকলের ভরসা ও আশ্রয়স্থল।

নাইট (Knight)

(ঘ) **নাইটদের শিক্ষা ও অভিষেক**: সামন্ততন্ত্র ও নাইট প্রথার ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটিকে ছাড়া আর একটির কথা চিন্তাই করা যাইত না। সামন্তদের আভিজাত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিত নাইট। কিন্তু অভিজাত বংশে

জন্মগ্রহণ করিলেই নাইট হওয়া যাইত না। নাইট হইতে গেলে বাল্যকাল হইতে যোদ্ধার আদব-কায়দা, নিয়মানুবর্তিতা, অস্ত্রবিদ্যা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা রীতিমত শিক্ষা করিতে হইত। অভিজাত শ্রেণীর বালকের শিক্ষা শুরু হইত সাত বৎসর বয়স হইতে। তখন হইতে তাহাকে অন্য কোন অভিজাত পরিবারে শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকিতে হইত। তখন তাহাকে বলা হইত 'পেজ' (Page, সাহায্যকারী)। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহার পদোন্নতি হইত স্কোয়ার রূপে (Squire)। ভাবী নাইট জীবনের আসল শিক্ষা সে লাভ করিত স্কোয়ার হইয়া। তাহাকে সর্বদা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে হইত। শিকার ও যুদ্ধাভিযানেও সে হইত প্রভুর সঙ্গী। শিক্ষানবিশীর কাল পূর্ণ হইলে খুব আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহাকে নাইটরূপে বরণ করা হইত। ভাবী নাইটকে পূর্বদিন উপবাস করিতে হইত এবং গির্জার মধ্যে একরাত্রি জাগিয়া অস্ত্র পাহারা দিতে হইত। পরদিন গির্জায় উপাসনার শেষে রাজা অথবা সামন্ত প্রভু তাহাকে নাইট সম্প্রদায়ে দীক্ষা দিতেন। নাইটকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি আজীবন ভগবান ও তাঁহার সামন্ত প্রভুর অনুগত থাকিবেন, ধর্ম ও ন্যায়ের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা করা এবং শরণাগত ও অসহায় দুর্বলদের আশ্রয়দান হইবে তাঁহার পবিত্র কর্তব্য।

(ঙ) **নাইটদের আদর্শ—শিভ্যালরি ঃ** নাইটরা ছিলেন শৌর্যে, বিশ্বস্ততায় ও সৌজন্যে অতুলনীয়। এক কথায় নাইট যে শুধু একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন

অশ্বারোহী নাইটদের যুদ্ধ (টুর্নামেন্ট)

তাহাই নহে, তাঁহাকে একজন আদর্শ চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইত। নাইটদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে ক্রমশঃ কয়েকটি নিয়মাবলী গড়িয়া উঠে আমাদের পৌরাণিক ক্ষাত্রিয় ধর্মের মত; ইংরাজীতে তাহাকে বলা হয় 'শিভ্যালরি' (Chivalry)। মধ্যযুগের প্রথমে সংস্কৃতির যে অবনতি দেখা গিয়াছিল নাইট প্রথার মহৎ আদর্শে তাহা অনেকটা পরিমার্জিত হয়।

(চ) অস্ত্র প্রতিযোগিতা (টুর্নামেন্ট): অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আমোদ-প্রমোদও ছিল সামরিক ধরনের। পশু শিকার ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা ছিল তাহাদের সবচেয়ে প্রিয়। ইহার প্রচলনও ছিল খুব বেশী। নাইটদের বীর যোদ্ধা যুবকদের শৌর্যবীর্য ও অস্ত্র প্রয়োগের কৌশল পরীক্ষার জন্য নকল যুদ্ধের মত এক প্রতিযোগিতা বা Tournament-এর আয়োজন করা হইত দুর্গ প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন দেশ হইতে নাইটগণ আসিয়া ইহাতে যোগ দিতেন। বিজয়ী নাইটদের নানা পুরস্কার ও জয়মাল্য দিয়া বরণ করিতেন রাণী বা রাজকুমারী। এই সমস্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতার সময়ে ও অন্যান্য উৎসবাদিতে চারণগীতির খুব প্রচলন ছিল। ভ্রাম্যমান চারণ কবিরা (Troubadours) নাইটদের বীরত্বের কাহিনী লইয়া রচনা করিতেন গীতিকাব্য ও বীণা বাজাইয়া সুললিত ছন্দে তাহা গাহিয়া বেড়াইতেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। লৌকিক ভাষায় রচিত গানগুলি শুধু জনপ্রিয় হয় নাই, আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনও করিয়াছিল।

ট্রুবাডুর (চারণ কবি)

(ছ) সামন্তযুগে জমিদারি প্রথা (Manorialism) সামন্তদের মধ্যে সকলের জমিদারি সমান মাপের ছিল না; ছোটবড় নানা আকারের ছিল কাহারও ছিল এক জায়গায় বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া একটি জমিদারি, আবার কাহারও ছিল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত বিশাল জমিদারি। দুই রকম জমিদারদের বাসগৃহ ও খামার যে অঞ্চলে থাকিত তাহাকে ইংরাজীতে ম্যানর (Manor) বলা হইত। এইরকম ম্যানরেই সামন্ত ভূপতির বাসগৃহ ও খামার ছাড়া থাকিত কাছারি ও সেরেস্তা। তাহা ছাড়া সামান্তপ্রথায় স্থানীয় শাসন ও বিচারাদির দায়িত্ব থাকিত জমিদারদের হাতে। ফলে ম্যানরের কাছারি হইয়া উঠে আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র। প্রজারা ও অধস্তন' সামন্তরা খাজনা আদায় দিত ম্যানরের খাজাঞ্চির দপ্তরে, নালিশ-মকদ্দমার

বিচারও হইত ম্যানরে প্রভুর সভাগৃহে। যাজকশ্রেণী ও অভিজাতশ্রেণীর নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা বিচার করিতেন। শাস্তি বিধানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অবশ্য থাকিত স্বয়ং সামন্ত প্রভুর হাতে।

(জ) **কৃষকদের অবস্থা ঃ** সমান্তপ্রথার যুগে গ্রামগুলি ছিল এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মত। গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য গ্রামেই উৎপন্ন হইত। ঘরে ঘরে কাপড় বোনা হইত। গ্রামের শিল্পী ও শ্রমিকরাই তাহাদের ব্যবহারের বাসন, জিনিসপত্র, চাষবাসের লাঙ্গল প্রভৃতি তৈয়ারী করিত। এক কথায় বলা যায়, গ্রামগুলি ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

গ্রামের কৃষকশ্রেণী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল,—স্বাধীন কৃষক (freeman) ও ভূমিদাস প্রজা, যাহাকে সার্ফ বা ভিলেন (Serf বা villein) বলা হইত। স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা ছিল অল্প। তাহারাও কোন না কোন সামন্ত প্রভুর অধীনস্থ প্রজা ছিল এবং তাহাদের খাজনা হিসাবে জমিদারকে নির্দিষ্ট অর্থ ও উৎপন্ন শস্যের অংশ দিতে হইত; উপরন্তু প্রয়োজনমত জমিদারের খাস জমিতে চাষের সাহায্য করিতে হইত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাহারা স্বাধীন ছিল এবং ইচ্ছা করিলে এক অঞ্চলের জমি ছাড়িয়া অন্য অঞ্চলে চলিয়া যাইতে পারিত। সার্ফদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। জমিদার ইচ্ছা করিলে তাহাদের যে কোন সময়ে জমি হইতে উঠাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা নিজের ইচ্ছায় জমি ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। এইজন্য সার্ফ বলিতে ভূমিদাস বুঝাইত। খাজনা হিসাবে সার্ফদের তিন চারিদিন প্রভুর জমি চাষ করিতে হইত। ফসল কাটিবার সময়ে আরও বেশী দিন জমিদারের কাজ করিতে হইত। তাহা ছাড়া প্রভুর বাসগৃহ ও বাগানে বিনা পারিশ্রমিকে সার্ফদের কাজ করিতে হইত। বলিতে গেলে সার্ফরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি। সার্ফের পুত্রকন্যারাও সার্ফই হইত। প্রভুর সম্পত্তি ছাড়া সার্ফবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ সহজ ছিল না। অত্যাচার উৎপীড়নের জ্বালায় কোন কোন সার্ফ পলাইয়া খ্রীষ্টান সাধু হইয়া যাইত। কেহ কেহ আবার শহরের কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ লইত। সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সার্ফদের বিদ্রোহের কাহিনীরও বর্ণনা আছে। সত্যসত্যই সার্ফদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্দশার।

গ্রামের কৃষিজমি তিন ভাগে ভাগ করা হইত। প্রত্যেক বৎসর অদলবদল করিয়া দুই ভাগে চাষ-আবাদ করা হইত। আর এক ভাগ ফেলিয়া রাখা হইত যাহাতে জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি ফিরিয়া আসে। আবার প্রত্যেক ভাগ

ছোট ছোট ফালিতে বিভক্ত করা হইত। এইরকম কয়েকটি ফালি লইয়া এক একজন প্রজার জমি ছিল। কিন্তু তাহা সাধারণতঃ এক জায়গায় থাকিত না। ফলে কৃষকরা একসঙ্গে চাষ করিতে পারিত না, এজন্য তাহাদের খুব অসুবিধা হইত, খরচও বেশী পড়িত। উচ্চহারে জমিদারের খাজনা দিয়া, তাঁহার জমিতে বেগার খাটিয়া, তাহাদের মুনাফা অল্পই হইত। প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও তাহাদের দৈন্যদশা ঘুচিত না।
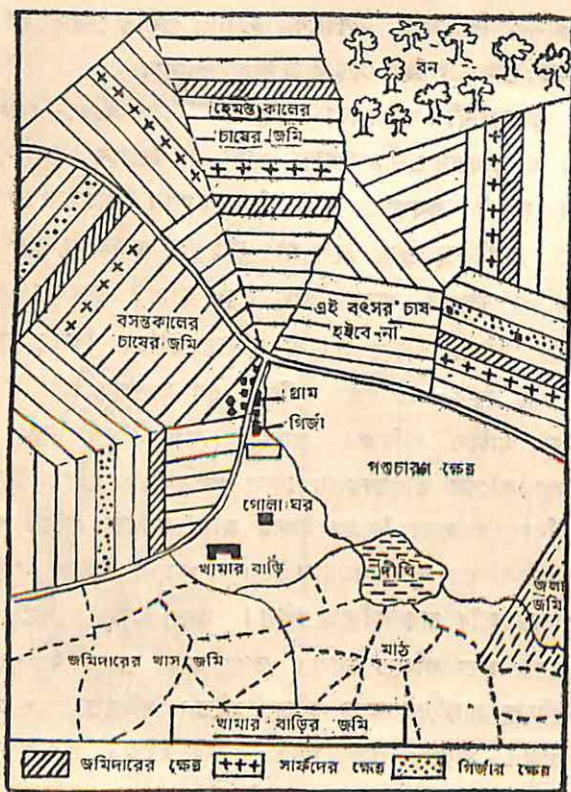
খামারের নক্সা

কৃষিজমি ছাড়া গ্রামের সাধারণের ব্যবহারের জন্য থাকিত খোলা মাঠ তৃণভূমি ও বন। সেখানে কৃষকরা তাহাদের গরু, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি চরাইতে ও কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিত। কৃষকদের কুটিরগুলির সব এক জায়গায় কাছাকাছি থাকিত। সেইগুলি হইত কাঠের তৈয়ারী, উপরে খড়ের আচ্ছাদন। কুটিরের চারিপাশে ছোট বাগান করিবার মত জায়গা থাকিত। সেখানে প্রয়োজনীয় শাক-সব্জির চাষ হইত। প্রায় প্রত্যেক

কৃষকেরই থাকিত কয়েকটি গরু, ভেড়া, শূকর, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষী। সাধারণভাবে কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত কঠোর। স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সকলকেই সারাদিন পরিশ্রম করিতে হইত। অন্যদিকে গ্রাম্য সামাজের মাধুর্যও ছিল। আহার ছিল পুষ্টিকর এবং সরল আমোদ-প্রমোদেরও অভাব ছিল না। গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্র ছিল গির্জাঘর (Parish Church)। সেইখানেই যাজকদের তত্ত্বাবধানে বসিত গ্রাম্য পাঠশালা। তাহা ছাড়া গির্জায় প্রায়ই ধর্মোৎসব হইত এবং সেই সকল উৎসব পল্লীজীবনে যোগাইত বৈচিত্র্যের আনন্দ।

(ঝ) **সামাজিক শ্রেণী ঃ** মধ্যযুগের সমাজে ছিল তিনটি শ্রেণী—যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণী ও কৃষককুল। যাজকগণ সংখ্যায় ছিলেন সবচেয়ে কম। তাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল মোটামুটি নির্বিঘ্ন। প্রতি গির্জারই সংলগ্ন বাগান জমি থাকিত। গির্জার নামে চাষের জমিও বন্দোবস্ত থাকিত। যাজক সম্প্রদায় নিজেদের ভজন-পূজন ও পঠন-পাঠন এবং গ্রামবাসীদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অপরদিকে অভিজাত শ্রেণীর সামন্ত ভূস্বামী, তাঁহার পরিবারবর্গ এবং নাইটগণ বাস করিতেন বিলাস বৈভবের মধ্যে দুর্গে বা প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দাসদাসী, সার্ফ ও পরিজন পরিবৃত হইয়া। তাঁহাদের সহিত সাধারণ কৃষকদের অবস্থা তুলনাই করা চলে না।

(ঞ) **ম্যানরের জীবনযাত্রা ঃ** জমিদারের বাসগৃহ (ম্যানর) শত্রুর আক্রমণের ভয়ে দুর্গের মত সুরক্ষিত করিয়া নির্মাণ করা হইত। বাসগৃহে ঘরের সংখ্যা খুব বেশী থাকিত না, প্রকাণ্ড একটি কেন্দ্রীয় কামরা হইতে ভোজনাগার ও উহার চারিদিকে থাকিত কয়েকটি শয়নকক্ষ। এইসব ঘরগুলিতে জানালার সংখ্যাও ছিল খুব অল্প এবং আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ফলে ঘরে আলো বাতাস বিশেষ প্রবেশ করিতে পারিত না। সেইজন্য দিনের বেলাতেও ঘরের মধ্যে জ্বলিত মোমের বাতি বা মশাল। দেওয়ালগুলি সাধারণতঃ রং করা হইত এবং তাহাতে বুটিদার পর্দা ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ঝোলান থাকিত। মেঝেতে টালি অথবা পাথর বসান থাকিত এবং তাহার উপর লম্বা ঘাস ও পাতা বিছান হইত। সিঁড়িগুলি ছিল সরু এবং ঘোরান। শীতকালে কাঠের আগুনে ব্যবস্থা থাকিত। খামারবাটিকার সবচেয়ে বড় কক্ষটিই ছিল ভোজনকক্ষ। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে অভিজাত সমাজে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ছিল একটি বড় পর্ব। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ভোজন-বিলাসী। ভূস্বামী ও তাঁহার পত্নী পরিবারের সকলকে লইয়া একসঙ্গে ভোজনের

টেবিলে সমবেত হইতেন। অন্যান্য আশ্রিত পরিজন এবং নাইট যোদ্ধাগণও আহারে যোগদান করিতেন; অর্থাৎ প্রতিদিনের আহারই হইত একটি ভোজসভা। প্রায়ই কোন উৎসব উপলক্ষে মহাভোজের আয়োজন হইত। তখন নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতের সমাগমে তাহা জমকালো হইয়া উঠিত। ভোজনের পরে নানারকম হাস্য-পরিহাসে কিছু সময় কাটান হইত। সেই সময়ে ভাঁড়ের রহস্যালাপ, চারণদের গান ও বাজীকরদের ক্রীড়াকৌশল অভ্যাগতদের চিত্ত বিনোদন করিত।

অভিজাত শ্রেণীর পোশাকেরও বেশ আড়ম্বর ছিল। তাঁহারা পরিতেন রেশমের জামা ও ব্রীচেস বা চুড়িদার পায়জামা। লম্বা মোজা ও সামনের দিকে উঁচু ঢেউ খেলান জুতা। তাহাদের কোমরে থাকিত ছোরা ও তরবারি এবং গলায় ঝোলান একটি ক্রশ চিহ্ন। অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন এবং অবসরকালে শিকার ও অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন। লেখাপড়া তাঁহারা বড় একটা শিখিতেন না। তাঁহাদের বেশীর ভাগ সময় কাটিত যুদ্ধবিগ্রহে। সেইজন্য যুদ্ধবিদ্যা ও নানা অস্ত্রের ব্যবহার তাঁহারা শিখিতেন। ইহাই ছিল মধ্যযুগের অভিজাত সমাজের রীতি।

অনুশীলনী

১। সামন্তপ্রথা কাহাকে বলে? সামন্তপ্রথা সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। সামন্ত প্রভুদের দুর্গের একটি বিবরণ দাও।

৩। নাইট কাহাকে বলে? নাইটদের শিক্ষা ও তাঁহাদের দীক্ষা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও। নাইটদের কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইত?

৪। সামন্তযুগে জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে কি জান? তাঁহাদের খামারবাটির বর্ণনা দাও।

৫। সামন্তযুগে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল? সার্ফদের জীবন সম্বন্ধে কি জান?

৬। গ্রামের কৃষিক্ষেত্র কিভাবে করা হইত ও কেন?

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—(ক) সামন্তপ্রথার সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন—, তিনিই ছিলেন সমস্ত—মালিক। (খ) ফিউডালিসম্ বলিতে শুধু—মালিকানা বুঝাইত না, আঞ্চলিক—ও বুঝাইত। (গ) প্রথম দিকে দুর্গের বাসগৃহ ছিল—তৈয়ারী, পরে—ব্যবহার প্রচলিত হয়।

(ঘ) দেশরক্ষার জন্য রাজার স্থায়ী — ছিল না। (ঙ) ভাবী নাইটকে পূর্বদিন—করিতে হইত এবং গির্জার মধ্যে জাগিয়া — পাহারা দিতে হইত। (চ) কৃষকশ্রেণী — ভাগে বিভক্ত ছিল,—কৃষক ও— প্রজা। (ছ) মধ্যযুগের সমাজে ছিল—শ্রেণী—, —ও—।

৮। টীকা লিখ : মুখ্য সামন্ত, শিভ্যাল্রি, টুর্নামেন্ট, চারণকবি (ট্রুবাডুর) ভূমিদাস, ম্যানর হাউস।

৯। সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও :—(ক) সামন্তপ্রথার রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক — হ্যাঁ/না। (খ) সর্বনিম্ন স্তরের চাষীদের বলা হইত — স্বাধীন প্রজা/সার্ফ। (গ) সামন্ত ভূস্বামীদের অঞ্চলে শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল — রাজার/সামন্ত প্রভুদের। (ঘ) শার্লমানের মৃত্যুর পরে কোন্ কোন্ দুর্ধর্ষ জাতি ইউরোপ আক্রমণ করে—ভিসিগথ/নর্মান/ভ্যাণ্ডাল/ম্যাগিয়ার/হুন/সারাসেন। (ঙ) মধ্যযুগের গ্রামগুলি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল ?—হ্যাঁ/না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ

মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুসালেমের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায় শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ। জেরুসালেম খ্রীষ্টানদের এক পবিত্র তীর্থস্থান। বিধর্মী মুসলমানদের কবল হইতে উহা রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলি হইতে বারবার যুদ্ধাভিযান হইয়াছিল। পুণ্য ধর্মস্থান রক্ষার জন্য অভিযান বলিয়া উহা 'ধর্মযুদ্ধ' নামে অভিহিত হয়। তাহা ছাড়া অভিযানকারীরা সকলে তাহাদের পতাকাতে বা বর্মে পবিত্র 'ক্রুশ' চিহ্ন ধারণ করিত। ইংরাজীতে সেইজন্য অভিযানগুলিকে বলা হয় ক্রুশেড (Crusade)।

সপ্তম শতাব্দীতে জেরুসালেম আরব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু তখন খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের কোন বাধা হয় নাই, তাহাদের উপর কোন অত্যাচারও করা হইত না। কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেলজুক তুর্কীদের শক্তি বিস্তারের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম তুর্কীদের হস্তগত হয় এবং তখন হইতে শুরু হয় খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন। এই

সংবাদ ইউরোপে পেঁছিলে সকলের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। রোমের খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবান সেই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সকল শ্রেণীর খ্রীষ্টানদের নিকট আবেদন জানাইলেন। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লেরমেণ্টের ধর্মসভায় পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া রাজা, সামন্ত ভূপতি, যোদ্ধা নাইট ও সাধারণ লোক সকলকেই পবিত্র তীর্থস্থান রক্ষার জন্য ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করেন। পোপের সঙ্গী সাধু পিটারও বিধর্মী মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলের মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই রকম প্রচারের ফলে দলে দলে লোক ধর্মযুদ্ধে যোগ দিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। পোপের ইচ্ছা ছিল একটি সম্মিলিত খ্রীষ্টান বাহিনী গড়িয়া তোলা, কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। ফ্রান্সের কয়েকজন সামন্ত নেতার অধীনে দুইটি বাহিনী, জার্মানীর ও ইটালীর খ্রীষ্টান বাহিনী লইয়া প্রায় চার-পাঁচটি অভিযানকারী দল গঠিত হইয়াছিল। পোপের নির্দেশে ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এক পুণ্যদিবসে প্রথম ক্রুশেড বাহিনী বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়া স্থলপথে জেরুসালেম অভিমুখে যাত্রা করিল।

ক্রুশেডের কারণ ঃ ধর্মের অনুপ্রেরণা ছাড়া ক্রুশেডের আরও অনেক কারণ ছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা খ্রীষ্টান মাত্রেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়া সকলেই স্বীকার করিত। সেলজুক তুর্কীদের হাতে খ্রীষ্টানদের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে তাহারা উত্তেজিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বাইজান্টাইন সম্রাট পশ্চিম ইউরোপে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট এবং পোপ দ্বিতীয় আরবানের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ বহু সামন্ত নেতা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশায় ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে নূতন নূতন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করা। সাধারণ লোকও বহু ক্ষেত্রে যোগ দিয়াছিল লুণ্ঠনের আশায়। চতুর্থতঃ ইটালীর কয়েকটি নগরী, ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অংশে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের আশায় ধর্মযুদ্ধ আন্দোলন সমর্থন করিয়াছিল।

প্রথম ক্রুশেড ঃ প্রথম ক্রুশেডের সময় খ্রীষ্টান বাহিনী কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার উত্তাপ ও পানীয় জলের অভাবে ইউরোপীয়রা খুবই কাতর হইয়া পড়ে। তথাপি তাহারা দুর্দান্ত সংগ্রাম করিয়া অ্যান্টিয়ক নগরী দখল করিয়া লয় (১০৯৮ খ্রীঃ) এবং পবিত্র খ্রীষ্ট

জন্মভূমির পুনরুদ্ধার সাধন করে। (১৫ই জুলাই, ১০৯৯ খ্রীঃ)। তাহার পর জেরুসালেমে একটি স্বাধীন খ্রীষ্টান রাজ্য স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া আরও কয়েকটি স্থান খ্রীষ্টান বাহিনী জয় করে এবং এক এক জায়গায় এক এক জন সামন্ত নেতার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রুশেডের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেরুসালেম পুনরুদ্ধার করা। তাহা সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সেই অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে। ইউরোপীয় ক্রুশেড অভিযানকারীরা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যাইলে জেরুসালেম ও খ্রীষ্টানে অধিকৃত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হীনবল হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় ক্রুশেড: দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান শক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠে এবং খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলির উপর আক্রমণ শুরু করে (১১৪৪ খ্রীঃ)। এই সংবাদ ইউরোপে পেঁছিলে দ্বিতীয় ক্রুশেড বাহিনী সংগঠিত হয় সাধু বার্ণার্ডের আহবানে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্রুশেডে খ্রীষ্টান বাহিনী কোনই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

তৃতীয় ক্রুশেড: কিছুকাল শান্তির পর সেলজুক সুলতান সালাউদ্দিন বা সালাদিনের নেতৃত্বে মুসলমান শক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠে। চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য মধ্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত নরপতিদের মধ্যে সালাদিন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন। তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার মহানুভবতা ও সদাচারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সালাদিন জেরুসালেম অধিকার করেন। তাহার ফলে শুরু হয় তৃতীয় ক্রুশেড্ (১১৮৯ খ্রীঃ)। তাহার নেতা ছিলেন জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক্ বারবারোসা, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ও ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস্।

ফ্রেডারিক বারবারোসা এশিয়া মাইনরে একটি নদী পার হইবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ফিলিপ অগাস্টাস্ও যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। একমাত্র রিচার্ড তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া সালাদিনের শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। জেরুসালেম উদ্ধার করিতে না পারিলেও রিচার্ড সালাদিনের সহিত সন্ধি করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। তাহার পর আরও কয়েকবার ক্রুশেড্ অভিযান পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রকৃত উৎসাহের অভাবে প্রতিবারই তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

ক্রুশেডের ফলাফল: প্রথম ক্রুশেডের ফলে কিছুকাল জেরুসালেমের অধিকার খ্রীষ্টানরা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। অর্থাৎ

ক্রুশেডের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু বারবার ক্রুশেড অভিযানের ফলে ইউরোপের সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছিল। প্রথমতঃ ধর্মযুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করিয়া ইউরোপের সামন্তশ্রেণী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সেই সুযোগে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ লোক, সার্ফশ্রেণী ও নাগরিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতাও সামন্ত ভূস্বামীদের কবলমুক্ত হয়। এক কথায়, ক্রুশেডের ফলে মধ্যযুগের প্রধান উপকরণ সামন্ত-প্রথার অবসান আসন্ন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়গণের ভৌগোলিক জ্ঞান বাড়িয়া যায় এবং তাহারা নূতন নূতন দেশ, ধর্ম ও সভ্যতার বিষয়ে জানিতে পারে। তৃতীয়তঃ এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়, বিশেষ করিয়া ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালীর উপকূলবর্তী নগরগুলি হইয়া উঠে বিদেশী বাণিজ্যের কেন্দ্র। তাহাদের বাণিজ্যপোতগুলি ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিত। চতুর্থতঃ ইউরোপ মুসলমানদের নিকট হইতে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, বিশেষ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে। তাহা ছাড়া প্রাচ্য হইতে অনেক নূতন নূতন জিনিসের আমদানি হইতে থাকে ইউরোপে ; যথা, খেজুর, তরমুজ, ও অন্যান্য ফল। দারুচিনি, লবঙ্গ, মরিচ প্রভৃতি মশলা ; চিনি, গন্ধদ্রব্য, কাঁচ ও কাঁচের আয়না, সাটিন, মখমল প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্য। ইহার ফলে ইউরোপীয়গণের পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার ও রুচির অনেক পরিবর্তন ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মযুদ্ধের ফলে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। আধুনিক যুগের জাতীয় রাজ্যগুলির অভ্যুদয়ের সূচনাও ইহার অন্যতম ফল বলা যায়।

অনুশীলনী

১। ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধ কথার অর্থ ? ধর্ম যুদ্ধের কারণ কি কি ?

২। কয়টি ক্রুশেডের বিষয় জান ? তাহাদের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

৩। সংক্ষেপে টীকা লিখ :—জেরুসালেম, পোপ দ্বিতীয় আরবান, সাধু পিটার, সালাদিন, সাধু বার্ণার্ড।

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(ক)—খ্রীষ্টানদের একটি পবিত্র —। (খ) ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারীরা তাহাদের — বা — পবিত্র —চিহ্ন ধারণ করিত। (গ) —খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম — হস্তগত হয়। (ঘ) ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে— ধর্মসভায় পোপ — মুসলমানদের বিরুদ্ধে — ঘোষণা করেন। (ঙ) ক্রুশেড অভিযানের ফলে ইউরোপের — ও —জীবনে অনেক — আসিয়াছিল।

৫। সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও :—(ক) জেরুসালেমে কাহার জন্মস্থান ? —হজরৎ মুহম্মদ/যীশুখ্রীষ্ট। (খ) প্রথম ক্রুশেড যাত্রা করে—১১৪৪/১০৯৬ খ্রীঃ। (গ) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড কোন ক্রুশেডে অংশ গ্রহণ করেন ?—১ম/২য়/৩য়।

নবম পরিচ্ছেদ
নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ

(ক) **নগরের উৎপত্তি ঃ** রোম সাম্রাজ্যে রাজধানী ছাড়া বহু বড় বড় নগর ছিল। জার্মান জাতির আক্রমণের ফলে তাহার অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্প ও বাণিজ্যেরও আবার ধীরে ধীরে উন্নতি হইতে থাকে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠে। সাধারণতঃ নূতন নগর স্থাপিত হইত কোন সামন্ত প্রভুর দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া, যাহাতে শত্রুর আক্রমণের সময়ে শিল্পী ও বণিকরা দুর্গের ভিতর আশ্রয় লইতে পারে। বড় বড় মঠ বা গির্জার সন্নিকটে, নদী বা সমুদ্র তীরেও নগরের পত্তন হইত।

প্রথম প্রথম নগর আর গ্রামে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নগরের প্রাচীরের বাহিরে ছিল কৃষিজমি এবং নগরবাসীরা প্রায় সকলেই বৎসরের কিছু সময় চাষবাস করিত। গ্রামের মত নগরের উপরেও ছিল সামন্ত প্রভুর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার। নগরবাসীদের অবস্থা গ্রামের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ভাল ছিল না। পরে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নগরের সংলগ্ন এলাকায় শিল্পী-কারিগরদের ও বণিকদের স্থায়ী বসতি গড়িয়া উঠে, সেখানকার জনসংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে থাকে। নগর-প্রাচীরের বাহিরের এলাকা 'সাবাব' (suburb) বলিয়া অভিহিত হইত। (ল্যাটিন urb শব্দের অর্থ নগর)। ক্রমে সেইসব অঞ্চল নগরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। নগরের আয়তন ও পরিধি বাড়িয়া উহা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ব্রিটেনের ক্যাম নদীর সেতুযুক্ত এলাকা হইয়া উঠে কেম্ব্রিজ (Cam-bridge) নগরী ; অক্সফোর্ড (Oxford), জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frank-furt) প্রভৃতিও ঐভাবে গড়িয়া উঠে।

(খ) **ক্রুশেডের অবদান ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ও নগরগুলির উন্নতিতে ক্রুশেডের অবদান অনস্বীকার্য। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে বারবার জেরুসালেমে অভিযানের ফলে ইউরোপীয় বণিকগণ প্রাচ্য দেশগুলির সহিত

সরাসরি ব্যবসা শুরু করে। এতদিন বাইজান্টাইন বণিকগণই ঐ ব্যবসা চালাইত। ক্রুশেড অভিযাত্রীদের সহিত সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসে ইটালীর ফ্লোরেন্স ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি নগরগুলি এবং তাহারাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়। ঐসব নগরগুলির প্রাচ্য দেশগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ঈজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে ইটালীর বণিকগণ একচেটিয়া ব্যবসার সুবিধা লাভ করে। ইটালীর দেখাদেখি জার্মানী ও ফ্রান্সের বিভিন্ন নগরের বণিকরাও বিদেশী বাণিজ্যে তৎপর হয়। ফ্রান্সের মার্সেলস্ নগর এই যুগের একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠে।

(গ) **বণিকসংঘ ও শিল্পীসংঘ** (Guids) ঃ প্রত্যেক নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ছিল বণিকসংঘ। তাহাদের হাতেই থাকিত ব্যবসায়ের একচেটিয়া ক্ষমতা। শ্রমিকরা কি ধরনের জিনিস তৈয়ারী করিবে, কোন্ কাজের জন্য কত মজুরি পাইবে, জিনিসের বিক্রয়মূল্য কত হইবে, নগরে কি কি জিনিস আমদানি করা হইবে ও কোন্ পণ্যদ্রব্য কত পরিমাণ রপ্তানি হইবে ইত্যাদি নির্ধারণ করা ছিল সংঘের প্রধান কাজ। সমৃদ্ধিশালী বণিকসংঘের উদ্যোগে নির্মাণ করা হইত বড় বড় গির্জা ও পুরসভা ভবন প্রভৃতি এবং জাঁকজমকের সহিত পালন করা হইত নানা ধর্মোৎসব।

বণিকসংঘগুলি যখন ক্রমে এক একটি ক্ষুদ্র স্বার্থপর ও মুনাফালোভী দলে পরিণত হইল তখন বিভিন্ন শিল্পী ও কারিগরদেরও সংঘ গড়িয়া উঠিল। শিল্পীসংঘের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বণিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শিল্প শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। প্রথমে প্রতি নগরে একটি করিয়া শিল্পীসংঘ স্থাপিত হয়, পরে একই নগরে একাধিক সংঘ গড়িয়া উঠিল, এক একটি শিল্পের জন্য এক একটি পৃথক সংঘ। তাহাদের কাজ ও নিয়মাবলী ছিল প্রায়শঃ বণিকসংঘের মত।

শিল্পীসংঘের একটি প্রধান কাজ ছিল শিল্পশিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করা। শিল্পী বা কারিগর হইতে গেলে দশ-বার বৎসর বয়স হইতে শিক্ষার্থীকে কোন প্রবীণ ও দক্ষ কারিগরের অধীনে সাত হইতে দশ বৎসর শিক্ষানবীশ থাকিতে হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কিছুকাল তাহাকে গুরুর নিকট মাহিনা করা মজুরের মত কাজ করিতে হইত এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিবার পর সে স্বাধীন শ্রমিকরূপে গণ্য হইত এবং শিল্পীসংঘের সদস্য হইতে পারিত।

(ঘ) **নাগরিক জীবন** ঃ মধ্যযুগের নগরগুলির ভিতরের চেহারা ছিল নানা বৈচিত্র্যে ভরা। একদিকে ছিল সামন্ত প্রভুর দুর্গ, বিরাট গির্জা, ধনী

বণিকদের সুরম্য অট্টালিকা, পুরসভা-গৃহ, ঘণ্টাঘর, জলের ফোয়ারা এবং কোন কোন নগরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অপরদিকে ছিল সাধারণ লোকের ঘিঞ্জ
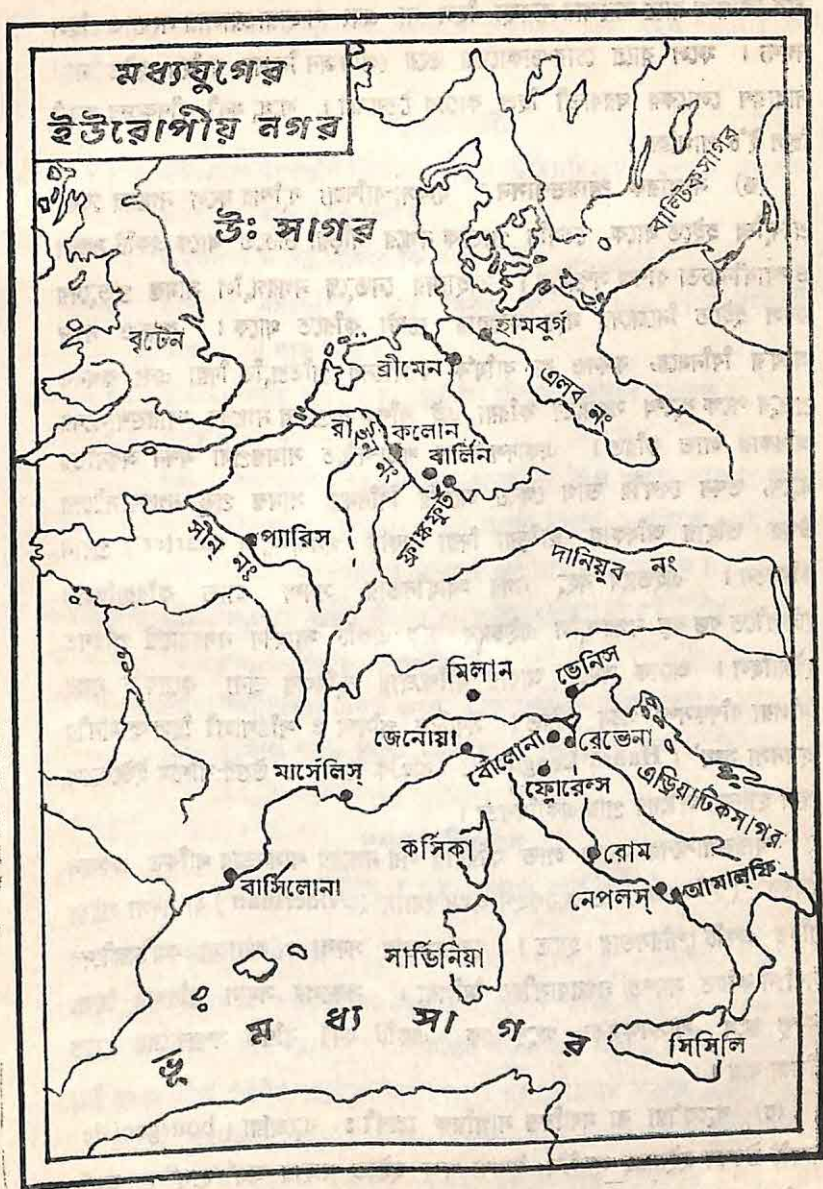
বসতি, ছোট ছোট টালির চালের বাড়ী। রাস্তাগুলির বেশীর ভাগই ছিল কাঁচা, একটু বৃষ্টি হইলে সেগুলি কাদাতে পিছল হইত। তাহা ছাড়া রাস্তা-

গলি ছিল অত্যন্ত সরু ও সাঁপল এবং জায়গায় জায়গায় স্তূপীকৃত থাকিত নোংরা আবর্জনা। বড় বড় নগরে প্রধান রাস্তাগুলি পাথরে বাঁধান ছিল, তবে কোথাও রাত্রে আলোর ব্যবস্থা ছিল না এবং পাহারাওয়ালার সংখ্যাও ছিল নগণ্য। ফলে রাত্রে চোর-ডাকাতের ভয়ে লোকজন বিশেষ বাহির হইত না। সাধারণ লোকের ঘরবাড়ী ছিল কাঠের তৈয়ারী। শুধু ধনী বণিকদের বাড়ী ছিল ইঁট পাথরের।

(ঙ) **নাগরিক স্বায়ত্তশাসন** ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে নগরের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি প্রত্যেক নগরে গড়িয়া উঠিতে থাকে একটি সচ্ছল ও স্বাধীনচেতা বণিক সম্প্রদায়। তাহাদের নেতৃত্বে নগরগুলি সামন্ত প্রভুদের কবল হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। কখনও নগদ অর্থের বিনিময়ে, কখনও বা বার্ষিক করদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং কখনও প্রভুর পক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিয়া এই বণিক সম্প্রদায় নগরের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সামন্তপ্রথা যখন অবনতির মুখে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে সামন্ত প্রভু নগরবাসীদের উপর তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া দিয়া একটি সনন্দপত্র (charter) প্রদান করিতেন। এইভাবে বহু নগর স্বাধীনতার সনন্দ লাভ করিয়াছিল। ইটালীতে বড় বড় নগরগুলি এইভাবে এক একটি স্বাধীন নগররাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। অনেক সময়ে আবার বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি নগর মিলিয়া বণিকসংঘ গঠন করিত। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল জার্মানীর 'হ্যানসা সংঘ' (Hansa League)। বল্টিক অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ছিল হ্যানসা লীগের প্রায় একাধিপত্য।

স্বায়ত্তশাসনের সনন্দ লাভ করিবার পর নগরের শাসনভার থাকিত একজন 'মেয়র' (Mayor) ও কয়েকজন অল্ডারম্যান (Alderman) বা সদস্য লইয়া গঠিত একটি পৌরসভার হাতে। পৌরসভার সদস্য ও অন্যান্য কর্মচারীদের নির্বাচন করিত সমস্ত নগরবাসীরা মিলিয়া। সকলের সমান অধিকার ছিল, কিন্তু ক্রমে শাসনক্ষমতা ক্ষুদ্র এক একটি ধনী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে চলিয়া যায়।

(চ) **বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণী** ঃ বুর্জোয়া (bourgeoisie) শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে ল্যাটিন burg শব্দ হইতে যাহার অর্থ 'দুর্গ'। অর্থাৎ দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া যে নগর গড়িয়া উঠে তাহার অধিবাসীরাই বুর্জোয়া। প্রথমে সকল নগরবাসী বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ছিল না। পরবর্তীকালে সামন্ত

প্রভু ও তাঁহার রক্ষীবাহিনী ছাড়া নাগরিক সমাজে ছিল দুইটি প্রধান শ্রেণী। যথা—(১) শিল্পশ্রমিক ও জনমজুর এবং (২) বণিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা দোকানদার এবং দক্ষ শিল্পী ও কারিগর যাহাদের বলা হইত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

অনুশীলনী

১। ইউরোপে নগরগুলি কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল? নগরের উন্নতিতে ক্রুশেডের অবদান কি ছিল?

২। বণিকসঙ্ঘ ও শিল্পীসঙ্ঘের কি কাজ ছিল?

৩। মধ্যযুগের নগরগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল? কেমন করিয়া নগরগুলি স্বায়ত্তশাসন লাভ করে?

৪। বুর্জোয়া কথার অর্থ কি? বুর্জোয়া বলিতে কাহাদের বুঝাইত?

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) নগর স্থাপিত হইত সামন্ত প্রভুর — কেন্দ্র করিয়া, যাহাতে শত্রুর আক্রমণের সময়ে — ও — দুর্গের ভিতর — লইতে পারে।

(খ) ব্রিটেনের — নদীর সেতুযুক্ত এলাকার নাম কেম্ব্রিজ।

(গ) ক্রুশেড অভিযাত্রীদের সহিত সহযোগিতা করে ইটালীর —, —, —, —প্রভৃতি নগরগুলি।

(ঘ) শিল্পীসঙ্ঘের একটি প্রধান কাজ ছিল — ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বুর্জোয়া শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে — শব্দ হইতে যাহার অর্থ —।

দশম পরিচ্ছেদ

চীনে মধ্যযুগ (৭ম—১৪শ শতাব্দী)

(ক) তাঙ্ সাম্রাজ্য (৬১৮—৯০৭ খ্রীঃ): চীনের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়সীমা সপ্তম হইতে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবনতির যুগ। কিন্তু চীনদেশে সেই সময়ে তাঙ্ বংশীয় সম্রাটদের রাজত্বকালে এক গৌরবময় যুগের সূচনা হয়।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধ হান্ সাম্রাজ্যের পতন হইলে চীনদেশে দুর্দিন ঘনাইয়া আসে। তখন হইতে প্রায় চারিশত বৎসর চলে দেশব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধবিগ্রহ। রাজনৈতিক স্থিরতা না থাকায় সমাজ ও শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বত্র দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও অবনতি।

সম্রাট তাঙ্ তাই সুঙ্ঃ এই অবস্থার অবসান হয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে সম্রাট তাঙ্ তাই সুঙ্-এর রাজত্বকালে (৬২৭-৬৫০ খৃঃ)। তাই সুঙ্-এর পিতা দ্বিতীয় কাওৎসু ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার দৃঢ় শাসনে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। তাই সুঙ্ ছিলেন চীনদেশের ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার রাজধানী ছিল ওয়েই নদীর তীরে সিয়েন্-ফু নগরী। তাঁহার প্রধান কীর্তি হান্ সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে সব অঞ্চল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের পুনরায় সাম্রাজ্যভুক্ত করা। তাই সুঙ্-এর সামরিক অভিযানের ফলে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে, হান্ সাম্রাজ্য হইতেও তাহার আয়তন ছিল বেশী বিস্তৃত।

সিংহাসন লাভ করিয়াই তাই সুঙ্ প্রথমে তাঁহার সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত ও উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া একটি দুর্দান্ত বাহিনী গড়িয়া তোলেন। পশ্চিমদিকে তাঁহার সাম্রাজ্য সীমা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত পেঁছায়। তাই সুঙ্ তুর্কী হানাদারদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; শত্রুর রাজ্যের অভ্যন্তরে পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের শক্তি চূর্ণ করেন (৬৩০ খৃঃ)। এইজন্য তাঁহার উপাধি হয় 'দৈবশক্তি সম্পন্ন খাঁ বা সম্রাট' (The Heavenly Khan)। এই সময়ে পশ্চিমী তুর্কী উইঘুর রাজ্য, পূর্ব মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া তাঙ্ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে। তারিম্ উপত্যকায় এবং কাশগড় ও ইয়ারখন্দে চীনা বাহিনীর ঘাঁটিও স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে তাই সুঙ্-এর পুত্র কাও-সুঙ্-এর রাজত্বকালে (৬৩০—৮৩ খৃঃ) এবং আর একজন বিখ্যাত সম্রাট মিঙ্-হুয়াং-এর সময়ে (৭১২—৫৬ খৃঃ) তাঙ্ সাম্রাজ্য পশ্চিমদিকে প্রায় ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত পেঁছিয়াছিল। এইভাবে সমগ্র চীনদেশে একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে তাঙ্যুগে।

শাসনব্যবস্থাঃ সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থাই সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ। এইজন্য সম্রাট তাই সুঙ্ আইনকানুনের অনেক পরিবর্তন করেন। বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশাসনের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী। তাঙ্ সম্রাটের ব্যবস্থা অনুযায়ী উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। তাহার ফলে সরকারী পদে অভিজাত পরিবারগুলি একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হইল। শিক্ষা এবং যোগ্যতাই হইল সরকারী কাজে নিয়োগের মাপকাঠি।

তাঙ্যুগে সমগ্র সাম্রাজ্য দশটি প্রদেশে বা 'তাও'-এ বিভক্ত ছিল। প্রতি প্রদেশে ছিল কতকগুলি জেলা (চৌ) এবং মহাকুমা (সিয়েন্)। জেলা ও

মহকুমাগুলির শাসকবর্গও নিয়োগ করিতেন সম্রাট স্বয়ং, অবশ্য সরকারী পরীক্ষা তাহাদের পাশ করিতে হইত। অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ কেন্দ্র পরিচালিত।

তাইস্যুঙের সাম্রাজ্য ও হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণপথ
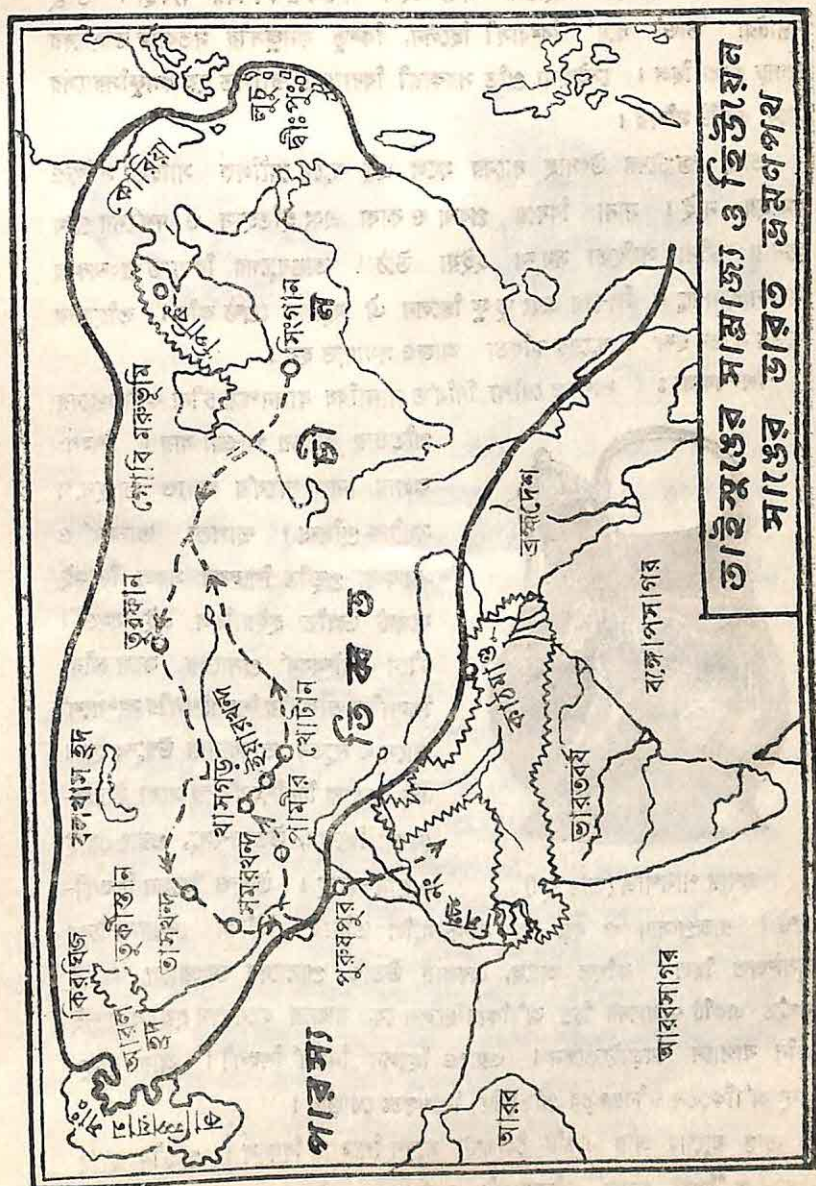
শিক্ষাব্যবস্থা ঃ বিদ্যোৎসাহী সম্রাট তাই সুঙ্-এর নির্দেশে প্রতি জেলায় ও মহকুমায় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কনফুসীয় সাহিত্য ও দর্শন, হান যুগের ইতিহাস, প্রচলিত আইনকানুন প্রভৃতি ছিল পাঠ্য বিষয়। যাহারা সৈন্যদলে যোগ দিতে চাহিত তাহাদের জন্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা। তাঙ্ সম্রাটরা 'তাও' ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু কনফুসীয় মতবাদে তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্য প্রতি সরকারী বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় কনফুসিয়াসের নামে একটি মন্দির।

তাঙ্ সম্রাটদের উৎসাহ দানের ফলে এই যুগে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিও কম হয় নাই। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ ও কাব্য এবং ইতিহাস ও দর্শনের গ্রন্থ রচনায় চীনা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তাঙযুগের বিখ্যাত প্রবন্ধকার ছিলেন হান-য়ু। লি-পো এবং তু-ফু ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাদের নূতন নূতন ছন্দ ও সুরের কবিতা আজও সমাদৃত হয়।

শিল্পকলা ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত নানাবিধ বাসনপত্রে চীনা কারিগরদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের জন্যও তাঙ্যুগ সমধিক প্রসিদ্ধ। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের সকল দিকেই যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এই সময়ে। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে চীনা শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পশৈলীর সংস্পর্শে আসে ও নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। এই যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, উতাও-ৎসু, ওয়াং-ওয়াই ও হান্-কান্। উতাও ছিলেন শিল্পীশ্রেষ্ঠ। রাজপ্রাসাদ ও বড় বড় মন্দিরগুলি তাঁহার আঁকা দেওয়াল-চিত্রে সুসজ্জিত ছিল। কথিত আছে, একবার উতাও প্রাসাদের দেওয়ালে এমনই নিখুঁত একটি বাগানের চিত্র আঁকিয়াছিলেন যে, রাজার মনে ভ্রম হয় যে সত্যই তিনি বাগানে বেড়াইতেছেন। ওয়াংও ছিলেন নিসর্গ শিল্পী। আর হান্-কান্ আঁকিতেন জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, বিশেষতঃ ঘোড়ার।
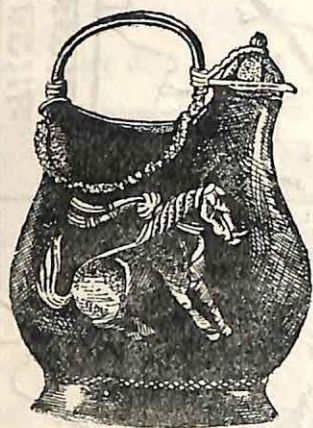
রূপার পানপাত্র (তাঙ যুগ)

তাঙ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ। প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথির বদলে চীনদেশেই সর্বপ্রথম কাঠের অক্ষর তৈয়ারী করিয়া

মুদ্রিত (ছাপা) বইয়ের প্রচলন হয়। প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাঙ্‌যুগেই।

তাঙ্‌ স্বর্ণপাত্র
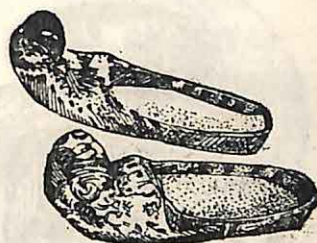
বিচিত্র সিল্ক পাদুকা (তাঙ্‌যুগ

চা : চা এখন প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই সর্বাধিক জনপ্রিয় পানীয়। প্রাচীনকাল হইতেই চা তৈয়ারী ও পরিবেশন করা চীনদেশে একটি পবিত্র সামাজিক প্রথা হইয়া উঠে। 'চা' শব্দটিও মূলতঃ চীনা শব্দ। কিন্তু তাঙ্‌যুগেই সর্বসাধারণের পানীয় হিসাবে সারাদেশে চায়ের ব্যাপক প্রচলন হয়।

আর্থিক অবস্থা : তাঙ্‌যুগে সাম্রাজ্যে আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সচ্ছল। এই সময়ে সারাদেশে কৃষির উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পায়, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও তেমনই প্রসার হয়। দক্ষিণ চীনের ইয়াংসি উপত্যকা স্বভাবতঃই উর্বর, সেখানে উন্নত সেচব্যবস্থা ও সার প্রয়োগের ফলে খাদ্যশস্যের বিরাট মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে। উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ছাড়া নানা শিল্পবস্তুও জলপথে ও স্থলপথে বিদেশে রপ্তানী হইত, যেমন—রেশমী বস্ত্র ও সূতা, কাঁচের ও চীনামাটির বাসনপত্র (porcelain), সুগন্ধি মশলাপাতি প্রভৃতি। তারিম উপত্যকা পার হইয়া মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া স্থলপথে বাণিজ্য চলিত। এই পথ বিশেষভাবে 'রেশম রপ্তানি পথ' (silk route) বলিয়া অভিহিত হয়। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন বন্দর। আরব, ইরানী এমন কি ভারতীয় বণিকরাও বড় বড় জাহাজ লইয়া ক্যান্টনে আসিত। বিদেশী বণিকদের দেখাশোনা করার জন্য একটি সরকারী দপ্তরও ছিল। এই সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের যে রকম উন্নতি হইয়াছিল তাহা চীনের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় নাই।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঃ বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি তাঙ্‌যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের উৎসাহে মধ্য এশিয়ার পথে মহাযান বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। তখন হইতে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশে গিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় নানা বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে, ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। আবার ফা-হিয়েনের মত কত চীনা পর্যটক বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। কনফুসীয় ও তাওধর্মের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঙ্‌যুগে বৌদ্ধধর্ম চীনের অন্যতম প্রধান ধর্ম হইয়া উঠে; দেশের সর্বত্র স্থাপিত হয় বৌদ্ধস্তূপ, মঠ ও বিহার, শাক্যমুনির মৈত্রী ও করুণার বাণী চীনা জনজীবনে আদর্শ হইয়া উঠে, গড়িয়া উঠে চিকিৎসালয় ও পান্থশালা, পাঠশালা ও ধর্মগৃহ। এক কথায়, তাঙযুগকে চীনের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বলা যায়।
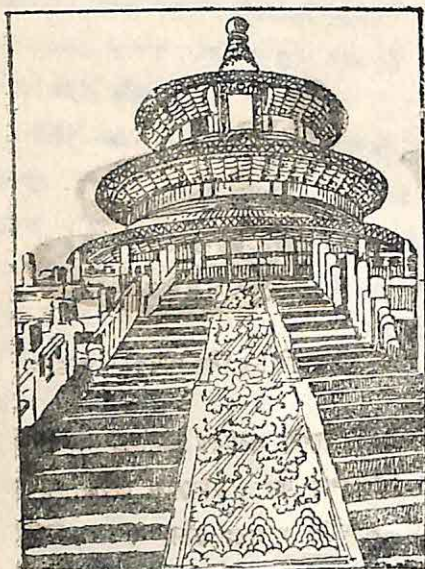
স্বর্গদ্বার মন্দির, পিকিং

তাঙযুগে চীনা সভ্যতা ও উন্নত সংস্কৃতি অচিরে সন্নিহিত দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। জাপান, কোরিয়া, আনাম (ইন্দোচীন) প্রভৃতি অঞ্চলে চীনা শিল্প ও সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন, এমনকি শাসন-ব্যবস্থারও অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বলিতে গেলে ঐসব দেশের সংস্কৃতি চীনা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

হুয়েন সাঙ ঃ বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ তাঙ্ যুগের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে হোনান্ প্রদেশের এক শিক্ষিত পরিবারে হুয়েন সাঙ্-এর জন্ম হয়। বাল্যকালে কনফুসীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা-লাভ করিলেও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত জ্ঞান-

লাভের আগ্রহে হুয়েন সাঙ্ তখনকার সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও একদিন গোপনে ভারত অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন (৬২৯খ্রীঃ)। তারিম উপত্যকার ভিতর দিয়া দুর্গম গোবি মরুভূমি পার হইয়া প্রায় দেড় বৎসর প্রচণ্ড ক্লেশ সহ্য করিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খাইবার গিরিপথের মুখে তিনি উপনীত হন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া হুয়েন সাঙ কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিভিন্ন বৌদ্ধ-তীর্থগুলি পর্যটন করেন এবং নানা বৌদ্ধাচার্যের নিকট শাস্ত্রপাঠ করেন; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুই বৎসর আচার্য শীল ভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন। হর্ষ-বর্ধন তখন উত্তর ভারতের সম্রাট। তিনি হুয়েন সাঙ্‌কে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁর সম্মানে কনৌজে একটি বিরাট ধর্মসভা ও মেলার আয়োজন করেন। হুয়েন সাঙ্-এর ভ্রমণ কাহিনী ভারতের ইতিহাসের এক অমূল্য উপাদান।

হুয়েন সাঙ

৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চল পদব্রজে পার হইয়া হুয়েন সাঙ্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বহু মূল্যবান পুঁথি ও স্মৃতি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। পুঁথিগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করা ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম চীনা সমাজে বিশেষ সম্মানের স্থান লাভ করে, চীন-ভারত সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হইয়া উঠে। তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কত চীনা ভিক্ষু ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইৎসিঙ্ (৬৭২-৯৫ খ্রীঃ)।

তাঙ্ সাম্রাজ্যের পতন ঃ রাজ্যবিস্তারে এবং শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঙ্‌যুগ ছিল একটি গৌরবময় যুগ। তথাপি কালক্রমে তাঙ্ সাম্রাজ্যেরও

পতন ঘনাইয়া আসে। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে চীনারা ক্রমশঃ শ্রমবিমুখ ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠে সেইজন্য সৈন্যদলে ও শাসনকার্যে অধিকাধিক বিদেশী (অর্থাৎ যাহারা খাস চীনের অধিবাসী নহে) নিযুক্ত করা হইতেছিল। এই-রূপ একজন উচ্চ রাজকর্মচারী আন্-লু-সান্ ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আন্-লু-সান্-এর বিদ্রোহ দুই বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে উত্তরাঞ্চলের বেশীর ভাগ অংশ বিদেশীরা দখল করিয়া লয়। দক্ষিণাঞ্চল চীনাদের অধিকারে থাকিলেও রাষ্ট্রের ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সুঙ সাম্রাজ্য (৯৬০-১২০০ খ্রীঃ)ঃ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আংশিক অবসান ঘটে সুঙ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে (৯৬০ খ্রীঃ) সুঙ্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাইৎসু ছিলেন কুশলী সমরনায়ক ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা তাইৎসুঙ্ চীনের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলে মোটামুটি সফল হইলেও উত্তরাঞ্চল তাঁহারা বিদেশীদের কবলমুক্ত করিতে পারেন নাই। উপরন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মাঞ্চুরিয়া হইতে 'চিন' জাতি উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

শাসনব্যবস্থায় সুঙযুগে অনেক নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এমনই একটি অভিনব ব্যবস্থা কাগজের মুদ্রা বা নোটের প্রচলন। চীনা মুদ্রা (সোনা-রূপা ও তামার) এত বেশী বিদেশী ব্যবসায়ীরা লইয়া যাইত যে দেশের বাজারে লেনদেনের অসুবিধা দেখা দেয়। সেইজন্য সুঙ্ সরকার কাগজের নোট চালু করেন।

সুঙ্‌যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরাঞ্চল বিদেশীদের অধিকারে থাকায় দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন হইয়া উঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বৈদেশিক বাণিজ্য মোটামুটি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত। বণিকরা শুল্ক দিয়া সরকার-নির্দিষ্ট পণ্যর বেচাকেনা করিতে পারিত। ইহার ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থাগম হইত। রপ্তানি হইত রেশমী বস্ত্র ও সুতা, চীনামাটির বাসন, কাঠের ও গালার কাজ করা সৌখিন দ্রব্যাদি, নানারকম মশলাপাতি, গণ্ডারের শিং, হাতির দাঁত, মণিমুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি মহার্ঘ পণ্য।

সুঙ্‌যুগের শাসন-সংস্কারে বিচক্ষণ মন্ত্রী ওয়াং আন্ শিহ্-র অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই ব্যবস্থা করেন যে প্রতি জেলার উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত সরকার ক্রয় করিয়া প্রয়োজনমত বিলিব্যবস্থা করিবেন। তাহাতে কৃষক যেমন নিশ্চিন্ত হইত ক্রেতাসাধরণ তেমন ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাইত। সরকারের

লাভও কম হইত না। ওয়াং-এর আর একটি উপকারী ব্যবস্থা ছিল কৃষকদের নামমাত্র সুদে ঋণদান। তৃতীয়তঃ জমিদারদের সকল জমি প্রতি বৎসর মাপজোখ করিয়া কর নির্ধারণ করা হইত। সুঙ শাসনের আর্থিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে ওয়াং-এর ভূমিকা ছিল অসামান্য।

সুঙযুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির লক্ষণীয় বিকাশ ঘটিয়াছিল। পঠন-পাঠনের মানও যেমন ছিল উন্নত ধরনের, পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও ছিল তেমন কঠোর। এই যুগেই ঘটে কনফুসীয় দর্শনের নবরূপান্তর, বৌদ্ধ ও কনফুসীয় মতবাদের এক অপূর্ব সমন্বয়। ইতিহাস চর্চাতেও সুঙযুগের অবদান কম নহে। সমগ্র তাঙ ও পরবর্তী যুগের ইতিহাস এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক ঘটনার গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়। কাব্য, সাহিত্য, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা উদ্ভিদ্বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করেন সুঙ-যুগের পণ্ডিতগণ। শিল্পসৃষ্টিতে সুঙযুগে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট হুই সুঙ স্বয়ং চিত্রশিল্পে অনুরাগী ছিলেন। তিনি রাজধানীতে একটি চিত্রাঙ্কন ও লিপি লিখনের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। চীনামাটির পাত্রের উপর বিচিত্র নক্সা ও শিল্পকর্ম সুঙযুগের একটি বৈশিষ্ট্য।

(গ) **য়ুয়ান বা মঙ্গোল সাম্রাজ্য** (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) দুর্ধর্ষ মঙ্গোল আক্রমণে অবশেষে সুঙ সাম্রাজ্যের পতন হইল (১২৭৯ খ্রীঃ)। শুরু হইল সমগ্র চীনদেশে মঙ্গোলজাতি শাসন।

চীনের উত্তর-পশ্চিম মঙ্গোলিয়া ছিল যাযাবর মঙ্গোলজাতির আদি বাস-ভূমি। ঐ অঞ্চলে পাওয়া যাইত বলিষ্ঠ ও বেগবান অশ্ব এবং তাহাই ছিল মঙ্গোলদের শক্তির উৎস। ঘোড়ায় চড়িয়া তীরধনুক কাঁধে দুরন্ত মঙ্গোল যোদ্ধা দূর দূর দেশে অভিযান করিত। তাহারা ঘরবাড়ীর পরোয়া করিত না, সারি সারি তাঁবু খাটাইয়া বাস করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস ও গরুর বা ঘোড়ার দুধ।

মঙ্গোলজাতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহাদের মধ্যে এক অসাধারণ বীর নায়কের আবির্ভাব হয়। তাঁহার নাম তেমুচিন। ইতিহাসে তিনি চিঙ্গিজ খাঁ নামে সুপরিচিত। তিনিই তাহার বাহুবলে মঙ্গোলজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। চিঙ্গিজ প্রথমেই চীনের উত্তরাঞ্চলে চিন রাজ্য অধিকার করেন। মধ্য এশিয়ার কাশগড় হইতে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহার আয়ত্তে আসে।

চিঙ্গিজের বংশধরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার পৌত্র কুবলাই খাঁ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অধিপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার রাজত্বকালেই কারাকোরাম হইতে রাজধানী পিকিং-এ স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ চীনের সুঙ্ সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া সমগ্র চীনদেশ মঙ্গোল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন কুবলাই খাঁ। প্রায় একশত বৎসর (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীঃ) চীন মঙ্গোল অধিকারে ছিল। কুবলাই খাঁ তিব্বত ও কোরিয়া জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও জাপানের বিরুদ্ধেও কয়েকবার অভিযান পাঠাইয়াছিলেন।

কুবলাই খাঁ।

এই বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা করার দক্ষতা ছিল কুবলাই খাঁর। সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি বড় বড় প্রদেশে বিভক্ত করিয়া সম্পূর্ণ কেন্দ্রের নেতৃত্বে শাসনব্যবস্থা চলিত। সারা চীনদেশে কাগজের টাকার প্রচলনও হয় এই সময়ে। কুবলাই দেশ জয় করিতেন বটে, কিন্তু বিজিতদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতেন, এমন কি রাজকার্যেও তাহাদের নিযুক্ত করিতেন। দেশে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বহু কল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন কুবলাই। ধর্মীয় ব্যাপারে কুবলাই গোঁড়া ছিলেন না। সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করিয়া তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের প্রতি কুবলাই-এর বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কুবলাই খাঁর সময়ে যে বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ইহার একটি সুফল হইয়াছিল এই যে, ইউরোপ হইতে সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার আদান-প্রদান বাড়িয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও সুগম হইয়াছিল।

কুবলাই খাঁর সময় হইতে মঙ্গোল সাম্রাজ্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার মৃত্যুর পরে (১২৯৪ খ্রীঃ) সেগুলি এক একটি স্বাধীন রাজ্য হইয়া যায়। যোগ্য শাসকের অভাবে মঙ্গোল শক্তিও ক্রমশঃ হীনবল হইয়া

পড়ে। কুবলাই-এর দুর্বল বংশধরগণ কোনমতে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহাদের বজায় রাখিয়াছিল।

কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্য ও মার্কোপোলোর চীন যাত্রা পথ
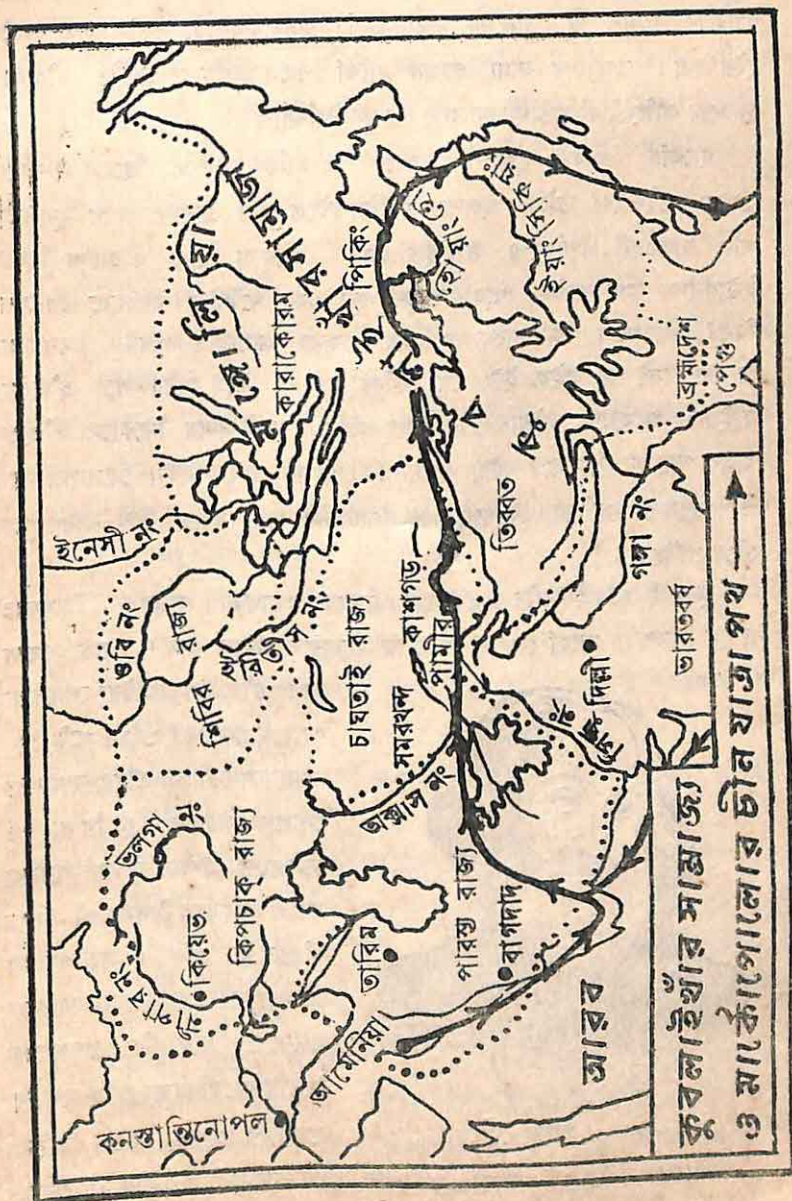
মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীঃ কুবলাই খাঁর সময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় মার্কো পোলো নামে একজন ইটালীয় পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী হইতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ইটালীর জেনোয়া ও ভেনিসের মধ্যে একটি জলযুদ্ধে বহু ভেনিসিয়ান বন্দী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন মার্কো পোলো, তাঁহার অতীত জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী বলিতে থাকেন আর একজন লিখিয়া রাখেন।

মার্কোর পিতা ও খুল্লতাত নিকোলো ও মাফিও পোলো ছিলেন বণিক। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা স্থলপথে ভেনিস হইতে মধ্য এশিয়ার পথে কুবলাই খাঁর রাজধানী পিকিং-এ উপস্থিত হন। মঙ্গোল সম্রাট তাহাদের নিকট ইউরোপের কথা শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হন এবং খ্রীস্টান ধর্মগুরু পোপের নিকট কয়েকজন ধর্মপ্রচারক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন। পোলো ভ্রাতৃদ্বয় সেই পত্র লইয়া ইউরোপে ফিরিয়া যান। দুই বৎসর পরে তাঁহারা দুইজন ধর্মযাজক লইয়া চীন যাত্রা করেন। সেই সময়ে নিকোলো তাঁহার বালক পুত্র মার্কোকে সঙ্গে লইয়া আসেন। তাঁহারা প্যালেস্টাইন মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের মধ্যদিয়া কাশগড় ও খোটানের পথ ধরিয়া তিন বৎসর পর চীনে পেঁছান।

কুবলাই খাঁ ইটালীয় পর্যটকদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বিশেষতঃ তরুণ সুদর্শন মার্কো পোলো তাঁহার সুনজরে পড়িয়া যান। প্রায় ষোল বৎসর চীনদেশে কাটাইয়া পোলোরা স্বদেশে ফেরেন (১২৯৫ খ্রীঃ)।

মার্কো পোলো

স্বদেশে ফিরিলে তাঁহাদের অদ্ভুত পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ও চীনদেশের ঐশ্বর্যের গল্প শুনিয়া সকলে তাঁহাদের মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলিয়া মনে করিত। অবশেষে এক ভোজসভায় তাহারা সকলের সম্মুখে তাহাদের মঙ্গোলীয় পোশাকের ভিতরে কতমণিমুক্তা আছে দেখাইয়া তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

চীনের বর্ণনাঃ মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনীতে চীন ও অন্যান্য কয়েকটি প্রাচ্য দেশের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়, যদিও তাহা মাঝে মাঝে

বেশ অতিরঞ্জিত। চীনদেশের বহু স্থানে মার্কো দেখিয়াছিলেন বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, সুরম্য নগরী, ভাল রাস্তাঘাট, সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির, পাঁথকদের জন্য সরাইখানা, দোকান বাজার, বড় বড় অট্টালিকা, বন্দরে বন্দরে দেশ-বিদেশের জাহাজ ও বণিকদের ভীড় প্রভৃতি বহু দ্রষ্টব্য জিনিস। হ্যাং চাও ও পিকিং এই দুইটি নগরীর বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন মার্কো। দুইটি নগরীর পরিধি ছিল বিশাল। ইঁট বা পাথরের দীর্ঘ রাজপথ ও প্রশস্ত খাল ছিল। পিকিং ছিল আয়তনে, সৌন্দর্যে ও লোকসংখ্যায় পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী। সেখানকার সম্রাটের প্রাসাদ ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

অনুশীলনী

১। চীনদেশে মধ্যযুগে সময়সীমা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান?

২। চীনে তাঙ্ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৩। তাঙ্ সাম্রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল? এই কার্যে সম্রাট তাই সুঙ্-এর কৃতিত্ব কি ছিল?

৪। তাঙ্‌যুগের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল? তখনকার শিক্ষাব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। তাঙ্‌যুগে শিল্পকলার কিরূপ উৎকর্ষ হইয়াছিল? কয়েকজন শিল্পীর নাম ও তাহাদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। তাঙ্‌যুগের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল? বৈদেশিক বাণিজ্যের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

৭। হুয়েন সাঙ্-এর ভারত ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তাঁহার ভ্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে কি জান?

৮। সুঙ্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? সুঙ্‌যুগে কি কি নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছিল?

৯। মঙ্গোলদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? চিঙ্গিজ খাঁ কিভাবে মঙ্গোল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন? তাঁহার বংশধরদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান?

১০। মার্কো পোলো কে ছিলেন? মার্কো কেমন করিয়া চীনে আসেন এবং কতদিন চীনে ছিলেন? তাঁহার বিবরণে চীনের কি বর্ণনা পাওয়া যায়?

১১। সংক্ষেপে লিখ—সিয়ান্ ফু, দৈবশক্তিসম্পন্ন খাঁ; তাও, চৌ ও সিয়েন; লি-পো ও তুফু, উ‍ঁতাও, ওয়াং ও হান্‌কান্; চাও, আন-লু-সান্, ওয়াং-আন্ শিহ্, নিকোলো ও মাফিও পোলো।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জাপানে মধ্যযুগ

জাপান দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তির অলৌকিক কাহিনী আছে জাপানী পুরাণে। কথিত আছে, দেবতা ইজানাগি ও দেবী ইজানাগি একটি রত্নখচিত বর্শা প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ডুবাইয়া তুলিয়া লন। সেই বর্শা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জলবিন্দু পড়িয়া সাগরের বুকে এক একটি দ্বীপ গড়িয়া উঠে। এইরূপ চার হাজারেরও বেশী দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত হয় জাপান বা সূর্যোদয়ের দেশ। জাপানীরা বলে 'দাই নিপ্পোন' (Dai Nippon)।

প্রাচীনকালে জাপানী সমাজ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহাদের সভ্যতাও ছিল নিম্ন মানের। তাহারা নানা জীবজন্তু, গাছ, পাথর প্রভৃতির পূজা করিত, আর পূজা করিত মৃত পিতৃপুরুষের আত্মার। সম্রাটকে তাহারা দেবতার অংশ বলিয়া মনে করিত। জাপানীদের প্রাচীনতম ধর্ম ছিল সিন্টো ধর্ম অর্থাৎ স্বর্গের পথ। সিন্টো ধর্ম ছিল খুব সরল ও অনাড়ম্বর। এখনও জাপানীরা অনেকে সিন্টো ধর্মের অনুরাগী।

জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে চীনাদের অবদান অনস্বীকার্য। চীনদেশের মতই জাপানে মধ্যযুগের শুরু হয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে। ৫২২ খ্রীষ্টাব্দে চীন হইতেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অল্পকাল মধ্যেই উহা জাপানীদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সম্রাটরাও অনেকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির স্থাপনা করান।

মধ্যযুগের জাপানী সমাজে ছিল চারিটি প্রধান শ্রেণী বা 'সেই' (Sei)। যথা, সামুরাই (অভিজাত সম্প্রদায়), শ্রমিক, কৃষক ও বণিক। ইহা ছাড়া ছিল অগণিত ক্রীতদাস ও নিম্নবর্ণের লোক। সামুরাই ব্যতীত অপর শ্রেণীগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি সমাকীর্ণ দ্বীপগুলিতে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল সীমিত, তথাপি কৃষিকার্যই ছিল জাপানীদের মুখ্য জীবিকা। ফসল ফলাইতে কৃষকদের প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহার উপর বৎসরে ত্রিশ দিন তাহাদের সরকারী জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে হইত। কারণ, সম্রাট ছিলেন সকল জমির মালিক। তিনি সামুরাই বা সামন্তদের জমি ইজারা দিতেন। কৃষকরা ছিলেন সামুরাইদের প্রজা। এককথায়, মধ্যযুগে জাপানের আর্থনীতিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক (Feudal)।

জাপানীরা মনে করিত যে, তাহাদের সম্রাটের জন্ম দেবকুলে এবং তিনি দেবতার মতই সর্বশক্তিমান। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট তেন্‌চি হইয়া উঠেন সার্থক রাষ্ট্রপতি, রাজ্যের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। সকল আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের ও রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করিতেন তিনি স্বয়ং: সকল প্রজাদের ভূমি-রাজস্বের আদায় দিতে হইত তাঁহাকেই। তাঁহার মহিমমণ্ডিত উপাধি হইল 'মিকাডো' (Mikado) বা দৈবশক্তিসম্পন্ন সম্রাট।

এই সময়ে সম্রাটদের উৎসাহে চীন ও কোরিয়ার সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। শুধু বৌদ্ধধর্মই নহে, জাপানী বেশভূষা আচার-আচরণ, শিল্পকলা ও সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্য, এমন কি শাসনপদ্ধতিতেও চীনের প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নূতন রাজধানী স্থাপিত হয় কিয়োটো শহরে। সেই নগর পরিকল্পনাও করা হয় চীনা ধাঁচে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, জাপানীরা চীনা বা বিদেশীদের অনুকরণ করিত না। তাহাদের রীতি-নীতি আয়ত্ত করিয়া নিজেদের মত করিয়া লইত।

সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত কয়েকটি অভিজাত পরিবারের সামন্তদের উপর। তাহাদের মধ্যে ফুজিয়ারা, মিয়ামোতো প্রভৃতি পরিবারের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। তাহাদের ক্ষমতা ক্রমে এত বাড়িয়া যায় যে সমগ্র শাসনব্যবস্থা তাহারাই পরিচালনা করিতে থাকে। সম্রাট তাহাদের হাতের পুতুলের মত হইয়া যান। এমন কি, সিংহাসনের অধিকারী নির্বাসনও করিত তাহারা।

সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার আর একটি কারণ বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। সিন্টো ধর্মে সর্বসাধারণের নিকট রাজার যে মর্যাদা ছিল, বৌদ্ধধর্মে তাহা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়িয়া উঠে জাপানের প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দির, হোরিউজি। সেই মন্দিরে স্থাপিত হয় দুইটি বোধিসত্ত্ব ও একটি প্রস্ফুটিত পদ্মাসনে ব্রোঞ্জের অপরূপ বুদ্ধমূর্তি পরবর্তী কালে বিরাট আকারে ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয় প্রাচীন রাজধানী নারা-তে (৭৪৭ খ্রীঃ) এবং কামাকুরাতে (১২৫২ খ্রীঃ)। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেখা যায় জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষ। কাঠের উপর লাক্ষারঞ্জিত অপূর্ব বুদ্ধমূর্তি জাপানী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় বহন করে। ৯০১-২১ খ্রীষ্টাব্দ ছিল জাপানের সুবর্ণ যুগ। এই সময়ে আর্থিক সমৃদ্ধিও যেমন বৃদ্ধি পায়, নানাবিধ শিল্পসৃষ্টির ফলে সমাজ-

জীবনেও তেমন বিলাসব্যসনের প্রসার ঘটে। অভিজাত সম্প্রদায়ই বিশেষ করিয়া হইয়া উঠেন বিলাসী ও আরাম-প্রিয়। এই অবস্থার সুযোগে উদ্ভব হয় একদল স্বৈরাচারী সামরিক নেতার। তাহাদের বলা হইত 'সোগুন' (Shogun) বা মহাসামন্ত। অভিজাত পরিবার-গুলির সামন্তদের চাপে পূর্বেই সম্রাটের মর্যাদাহানি হইয়াছিল। এখন সোগুনদের প্রভাবে তাহা নামে মাত্র সম্রাট পদে পর্যবসিত হইল। রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল কর্তৃত্ব দুর্বল সম্রাটের হাত হইতে চলিয়া গেল সোগুনদের হাতে। প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় সোগুনরাই করিত। প্রজাসাধারণও তাহাদের অধিকার স্বীকার করিত, কারণ তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি দস্যু-তস্করের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিত সোগুন ও তাহার রক্ষীদল।

লাক্ষারঞ্জিত কাঠের বুদ্ধমূর্তি

সংক্ষেপে বলা যায়, একাদশ শতাব্দী হইতে জাপানের ইতিহাস সোগুন সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস। সোগুনদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বিখ্যাত হন হিদেয়োশি (১৫৮১-৯৮ খ্রীঃ) এবং ইয়োয়াশু (১৬০৩-১৬ খ্রীঃ)।

জাপানী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শীর্ষে সম্রাটের স্থান নির্দিষ্ট থাকিলেও প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল সোগুনদের বা মুখ্য সামন্ত-দের হাতে। তাহাদের প্রত্যে-কের অধীনে থাকিত বেতনভোগী সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী। তাহাদের বলা হইত

ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি কামাকুরা

'সামুরাই'। মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইট (Knight)-দের মত ছিল সামুরাইদের সংগঠন। জাপানী সামন্তসমাজে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তিই ছিলেন একজন সামুরাই যোদ্ধা। লেখাপড়া তাহাদের বিশেষ করিতে হইত না। নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে তরবারি চালনা এবং যুদ্ধে শত্রুনিধন অথবা মৃত্যু-বরণ ছিল সামুরাইদের কর্তব্য। সেজন্য তাহারা বেতন ও অন্যান্য ভাতা পাইত এবং তাহাদের কোন কর দিতে হইত না। তরবারিই ছিল সামুরাইয়ের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু এবং সেই তরবারির সদ্ব্যবহার করাই ছিল তাহাদের ব্রত।

ইউরোপীয় নাইটদের যেমন শিভ্যালরির নীতি মানিয়া চলিতে হইত, জাপানী সামুরাইদেরও তেমন 'বুশিদো' (Bushido) নীতি পালন করিতে হইত তাহাদের আচার-আচরণে। ন্যায় ও নিষ্ঠা ছিল বুশিদো নীতির সার কথা। ইউরোপীয় নাইটদের মতই প্রত্যেক সামুরাই ছিল বুশিদো নীতি পালন করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সামুরাই এই নীতি অনুযায়ী কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিত না, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিত না এবং বীর ধর্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইত না। সামুরাই সাদাসিধা জীবন যাপন করিত এবং বিলাসব্যসনে মত্ত হইত না। প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ থাকা বুশিদো নীতির অন্যতম মূল শিক্ষা। সর্বদা প্রভুকে বিপদে-আপদে রক্ষা করাই ছিল তাহার ধর্ম। প্রভুর জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিতেও সামুরাই সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। এমন কি, প্রভুর মৃত্যুতে পরলোকে প্রভুর সেবা করার জন্য সে 'হারিকির' অর্থাৎ পেটে ছুরি মারিয়া আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। হারিকিরি সামুরাইয়ের আত্মসম্মান রক্ষার অন্যতম উপায় বলিয়া বুশিদো নীতিতে স্বীকৃত। এমন কি, কোন কর্তব্যকর্মে অক্ষমতার জন্য নিষ্ঠাবান সামুরাই হারিকীর করিত। সেজন্য সে সর্বদাই একটি ছোট ধারালো ছুরি সঙ্গে রাখিত। সামুরাই যুবকের 'সেপ্পুকু' বা হারিকীর করার পদ্ধতি ছিল অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়।

অনুশীলনী

১। জাপান দ্বীপপুঞ্জ উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। প্রাচীনকালের জাপানী সামাজের সম্বন্ধে কি জান? মধ্যযুগে জাপানী সমাজব্যবস্থার ও আর্থনীতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কথা কি জান? তাঁহাকে 'মিকাডো' (Mikado) বলা হইত কেন? সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পাইল কি কারণে?

৪। 'সোগুন' কাহাদের বলা হইত? তাহারা কি ভাবে রাষ্ট্রের প্রধান হইয়া উঠে?

৫। সামুরাইদের সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। বুশিদো নীতি কি ভাবে সামুরাইদের নিয়ন্ত্রণ করিত?

৬। জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে চীনাদের অবদান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

৭। সংক্ষেপে লিখ—দাই নিপ্পোন, সিণ্টোধর্ম, কিয়োটো, হারিকিরি।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

(ক) — হাজারের বেশী দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত হয় — বা — দেশ।

(খ) মধ্যযুগের জাপানী সমাজে ছিল — শ্রেণী বা —।

(গ) — খ্রীষ্টাব্দে জাপানের নূতন — — হয় কিয়োটো শহরে।

(ঘ) — যুবকদের — বা হারিকিরি করার পদ্ধতি ছিল অবশ্য — বিষয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে মধ্যযুগ

ক. **গুপ্তোত্তর যুগ (৬ষ্ঠ—৭ম খৃষ্টাব্দ)—হূণ আক্রমণ:** ইউরোপে হূণ জাতির অভিযানের ফলে কিভাবে বিশাল রোম সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, তাহা তোমরা পড়িয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষেও আর একদল হূণের আক্রমণের ফলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

চীনে হান্ সাম্রাজ্যের শক্তি বিস্তারের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে যাযাবর হূণ জাতি পশ্চিমদিকে বিতাড়িত হয়। তাহাদের একটি শাখা ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করে এবং অপর একটি শাখা অক্ষু নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে। তাহাদের সাধারণতঃ শ্বেত হূণ বলা হয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইউয়ে-চি নামে তাহাদের একটি শাখা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয় এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হূণগণ অক্ষু উপত্যকা হইতে দক্ষিণে ও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া পারস্য, কাবুল ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার রাজ্য জয় করে। ভারতের অভ্যন্তরেও এই সময়ে কয়েকবার হূণ আক্রমণ হইয়াছিল, তবে প্রথম সুগঠিত হূণ বাহিনীর আক্রমণের কথা শোনা

যায় গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (৪৫৫—৬৭ খ্রীঃ)। প্রচণ্ড সংগ্রামে স্কন্দগুপ্ত হূণশক্তি এমন ভাবে চূর্ণ করেন যে, বহু দিন তাহারা আর ভারতে অভিযান করিতে পারে নাই। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণদের প্রবল আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হইয়া পড়ে।

হূণ নেতা তোরমান পঞ্চম শতাব্দীর শেষে দুর্বল ও খণ্ডিত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পাঞ্জাব হইতে মালব পর্যন্ত ভূভাগ দখল করিয়া হূণ রাজ্য স্থাপন করেন। অনেক ভারতীয় নৃপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এইজন্য তোরমান মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (আনুমানিক ৫০২ খ্রীঃ) তাঁহার পুত্র মিহিরকুল হূণ রাজ্যের অধিপতি হন। শাকলনগরীতে (পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে) ছিল তাঁহার রাজধানী। মিহিরকুলের নৃশংসতার বহু কাহিনী বলা আছে হুয়েন সাঙের বিবরণীতে ও কলহণের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে। অবশেষে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য ও মালবের যশোধর্মনের সহিত যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত হন। ভারতে হূণ শক্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহার পরও উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ছোট ছোট হূণ রাজ্য ছিল। কালক্রমে হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়া এবং হিন্দুদের সহিত বিবাহ করিয়া তাহারা হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায়। পরবর্তী কালে যাহারা 'রাজপুত' জাতি বলিয়া পরিচিত হয় এবং একাধিক শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তোলে, তাহাদের অধিকাংশ হূণ জাতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

হর্ষবর্ধন—কনৌজ সাম্রাজ্য ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর ভারতে দুইটি রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে,—কনৌজের মৌখরী রাজ্য এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজ্য। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সহিত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনের বিবাহ হয়। তাহার ফলে তাহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ সময়ে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহিত একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেন। দেবগুপ্তের সহিত যুদ্ধে গ্রহবর্মন নিহত হন। রাজ্যশ্রীও হন বন্দিনী। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে কনৌজ যাত্রা করেন। পথে দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন। কিন্তু ইহার পরই শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সংশয় আছে।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া কনৌজ যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী মুক্তিলাভ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। হর্ষবর্ধন স্বয়ং ভগিনীকে উদ্ধার করেন। তারপর রাজ্যশ্রী এবং কনৌজ রাজ্যের প্রধানদের আগ্রহে ঐ রাজ্যের শাসনভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় (৬০৬ খৃীঃ)। কনৌজ ও থানেশ্বরের মিলিত রাজ্যের অধিপতি হইলেন হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য। সিংহাসন লাভের পরই হর্ষ দিগ্বিজয়ের সংকল্প ঘোষণা করেন। প্রথমেই শশাঙ্কের

হর্ষবর্ধন

বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন। শশাঙ্কের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল কি না হর্ষচরিত লেখক বাণভট্ট সে সম্বন্ধে নীরব। হুয়েন সাঙও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। বরং তাঁহার বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ তাঁহার দ্বিতীয় অভিযানে মগধ ও পশ্চিমবঙ্গ এবং কঙ্গোদ ও কলিঙ্গ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ইহার পূর্বে হর্ষ সৌরাষ্ট্রের বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। হর্ষের দক্ষিণ অভিযান সফল হয় নাই। নর্মদা নদীর তীরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হর্ষের বাহিনীকে পরাজয় বরণ করিতে হয়।

গুপ্তোত্তর যুগে হর্ষবর্ধন পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গঠনে কৃতকার্য না হইলেও হর্ষ উত্তর ভারতে এক সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। একটি চালুক্য তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পাঞ্জাব হইতে উড়িষ্যা এবং মগধ ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কাশ্মীরও তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া মনে করা হয়।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারত

ভ্রমণে আসেন। তাঁহার প্রভাবে হর্ষ বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হন। কনৌজে এজন্য তিনি একটি ধর্মমহাসম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিকী মহাসভার অধিবেশন তাঁহার ধর্মানুরাগ ও দানশীলতার পরিচায়ক। স্বয়ং সুকবি হর্ষবর্ধন গুণীজনের সমাদর করিতেন। বাণভট্ট ছিলেন তাঁহার সভাকবি। নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত সম্রাট হর্ষবর্ধন আনুমানিক ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

হুয়েন সাঙ্‌ঃ ফা হিয়েনের দুইশত বৎসর পরে ভারত ভ্রমণে আসেন হুয়েন সাঙ্‌। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চা। তিনি চৌদ্দ বৎসর (৬৩০—৪৪ খৃীঃ) ভারতের নানা বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন করেন এবং তৎকালীন জনজীবনের এক উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজে তিনি আট বৎসর ছিলেন। তখনকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল সৎ ও সচ্চরিত্র। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ছিল সচ্ছল। তাহারা রেশম, পশম ও সূক্ষ্ম মসলিনের পোশাক পরিত। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নান ছিল তাহাদের নিত্যকর্ম। গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পসজ্জা তাহাদের প্রিয় ছিল। তাহাদের খাদ্য ছিল অন্ন ও পিঠা, শর্করা ও দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন, সরিষার তৈল, মাছ, মাংস প্রভৃতি। আঙ্গুর ও আখের রস হইতে প্রস্তুত মাদক পানীয়েরও প্রচলন ছিল।

সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণও পাওয়া যায় হুয়েন সাঙের গ্রন্থে। দেশের বহুস্থানে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। চারি বেদ ও ব্যাকরণের অধ্যয়ন প্রায় আবশ্যিক ছিল। গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নিষ্ঠার কথাও তিনি লিখিয়াছেন। একাধিক বৌদ্ধাচার্যের নিকট তিনি শাস্ত্রচর্চা করেন ও তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। নালন্দা তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের সকল বিষয় ছাড়া বেদ বেদান্ত, ন্যায় ও দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রেরও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এবং সুদূর চীন, কোরিয়া, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ হইতে অসংখ্য শিক্ষার্থীর সমাগম হইত নালন্দা মহাবিহারে। ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ লইয়া প্রায় দশ হাজার জনের

নালন্দা মহাবিহার

বাসস্থান ছিল। তাহাদের সমুদয় ব্যয়ভার রাজকোষ বহন করিত। হুয়েন সাঙ সেখানে কয়েক বৎসর আচার্য শীলভদ্রের নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। হুয়েন সাঙের বিবরণী ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

(খ) **হর্ষোত্তর যুগ** (৮ম—১২শ খ্রীষ্টাব্দ): হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিভিন্ন প্রান্তে গড়িয়া উঠে আঞ্চলিক সামন্ত রাজ্য। কনৌজ (কান্যকুব্জ) তখন ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তী প্রায় দুই শত বৎসর উচ্চাভিলাষী রাজাদের মধ্যে চলে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম। কনৌজ অধিকার করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য। তাহাদের মধ্যে রাজপুতানার গুর্জর প্রতীহার রাজবংশ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা সূর্যবংশের রামানুজ লক্ষ্মণের বংশধর বলিয়া দাবী করে। পণ্ডিতদের অনুমান, তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে আগত হূণগুর্জর জাতির একটি শাখা। এই বংশের রাজা প্রথম নাগভট অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যশস্বী হন। তাঁহার পৌত্র বৎসরাজ মালব ও পূর্ব রাজপুতানা অধিকার করিয়া কনৌজের দিকে অগ্রসর হন। গৌড়ের রাজা ধর্মপাল ছিলেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বৎসরাজ কনৌজে রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব নিরুপমের লক্ষ্যও ছিল কনৌজের সিংহাসন। তাঁহার আক্রমণে বৎসরাজ পরাজিত হইয়া কোনমতে রাজস্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ধ্রুব স্বদেশে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া তাঁহার অনুগত চক্রায়ুধকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট ধর্মপাল ও চক্রায়ুধকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহারও সৌভাগ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে নাগভট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন (৮০৫—০৬ খ্রীঃ)। প্রতীহারগণ দমিবার পাত্র ছিলেন না। দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র মিহিরভোজ (প্রথম ভোজরাজ) কনৌজ পুনরুদ্ধার করেন (৮৩৬ খ্রীঃ)। তখন হইতে কান্যকুব্জ হইল তাঁহাদের স্থায়ী রাজধানী। পাঞ্জাব হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পালরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল হইতে কাথিয়াওয়াড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ভোজের রাজ্যসীমা। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপালের সময়ে প্রতীহার সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। পূর্বদিকে মগধ ও উত্তরবঙ্গ তিনি রাজ্যভুক্ত করিয়া ছিলেন। মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর (৯০৭—০৮ খ্রীঃ) হইতেই প্রতীহার সাম্রাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

চন্দেল্ল, কলচুরি (চেদি), পরমার, চৌলুক্য প্রভৃতি সামন্ত নৃপতিগণও একে একে স্বাধীন হইয়া যায়। আরও শতাধিক বৎসর নামেমাত্র অস্তিত্ব রজায় রাখার পর গজনীর সুলতান মাহমুদের আক্রমণে প্রতীহার রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় (১০১৮ খৃীঃ)। উত্তর ভারতে তখনও রাজপুত রাজ্যগুলি পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত। এই অনৈক্যের সুযোগে আফগানিস্তানের ঘুর রাজ্যের অধিপতি মুহম্মদ ঘুরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তরাইনের যুদ্ধে (১১৯১—৯২ খৃীঃ) আজমীরের রাজা পৃথিরাজ চৌহানকে পরাজিত ও নিহত করেন। সেই সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যও অস্তগামী হইল।

(গ) **বঙ্গদেশ—শশাঙ্ক ঃ** গুপ্তযুগে বঙ্গদেশের বেশীর ভাগ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের পতনের পরেও গুপ্ত নামধারী অপর এক রাজবংশ মগধে রাজত্ব করিতেন। ঐ পরবর্তী গুপ্তবংশের রাজা মহাসেনগুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন শশাঙ্ক। রোটাসগড়ের গিরি-গাত্রে এক শিলালিপিতে শশাঙ্ক 'শ্রীমহাসামন্ত' বলিয়া উল্লিখিত হন। এই সময়ে কনৌজের মৌখরিদের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মহাসেনগুপ্ত হীনবল হইয়া পড়িলে শশাঙ্ক বাংলার খণ্ড খণ্ড অংশ সম্মিলিত করিয়া স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁহার রাজধানী। সম্প্রতি রাজবাড়ী-ডাঙ্গাতে খননকার্যের ফলে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণে উৎকল ও কঙ্গোদ রাজ্য এবং পশ্চিমে মগধ জয় করার ফলে গৌড়রাজ্য প্রায় একটি সাম্রাজ্য হইয়া উঠে। উচ্চাভিলাষী শশাঙ্ক উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তারের অভিপ্রায়ে মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহিত একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেন। তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল, তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। হর্ষবর্ধন কনৌজের সম্রাট হইয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু (হুয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ৬৩৭ খৃীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধিকারে ছিল!) ৬০৬ খৃীষ্টাব্দ হইতে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল তিনি মগধ হইতে কঙ্গোদ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

পাল রাজবংশ ঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে বারবার বহিঃশত্রুগণের আক্রমণে গৌড়রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। অরাজক অবস্থায় সকলের অত্যাচারে দুর্বল প্রজাবর্গের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। এইরূপ অরাজকতাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয় (অর্থাৎ যেমন বড় মাছ ছোট-মাছগুলিকে খাইয়া ফেলে)। এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য দেশের হিতকামী নেতৃবর্গ গোপাল নামে

একজন বীর সেনানায়ককে রাজা নির্বাচিত করেন। আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন গোপাল। পরবর্তী রাজাগণের 'পাল' উপাধি হইতে তাঁহাদের পালবংশীয় বলা হয়। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীঃ) ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। উত্তর ভারতের রাজনীতিতে তিনি একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। প্রবল পরাক্রান্ত গুর্জর প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সহিত একাধিক যুদ্ধের পর ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন। সে কাহিনী তোমরা পড়িয়াছ। গোপালের সুযোগ্য পুত্র দেবপালের শৌর্য বীর্যে পাল সাম্রাজ্যের সীমা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যবদ্বীপ ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবও দেবপালের সহিত মিত্রতা সম্পর্ক স্থাপন করেন। দেবপালের মৃত্যুর (৮৫০ খ্রীঃ) পর রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শত্রু-কবলিত হইয়া পড়ে। একাদশ শতকের প্রথমদিকে প্রথম মহীপাল পালবংশের শক্তি অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু পুনরায় বহিঃশত্রুদের আক্রমণে পালশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে (১০৭০ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গে স্বাধীন বর্মন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রীর সামন্তগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে মহীপাল নিহত হয়। দিব্বোক নামে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, জাতিতে কৈবর্ত, এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। তিনিই স্বাধীন বরেন্দ্রীর রাজা হন। এইজন্য ইহা 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' বলিয়া আখ্যাত হয়। রামপাল রাজা হইয়া তুমুল যুদ্ধের পর কৈবর্তদের পরাস্ত করিয়া পাল শক্তির হৃত গৌরব পুনরুজ্জীবিত করেন। রামপাল পালবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা।

সেন রাজবংশ ঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পালরাজ্যের পতনের পর বাংলা দেশে সেন রাজত্বের অভ্যুদয় হয়। সেনরাজগণের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশে। এই বংশের সামন্তসেন কর্ণাট হইতে আসিয়া রাঢ় দেশে গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন ঐ অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন। হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন সেনরাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন প্রথমে রামপালের একজন সামন্ত রাজা। দক্ষিণ রাঢ়ের শূর রাজকন্যা বিলাসদেবীর সহিত বিবাহের ফলে সমগ্র রাঢ় দেশে বিজয়সেনের আধিপত্য স্থাপিত হয়। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালকে পরাস্ত করিয়া তিনি বরেন্দ্রীর একাংশ অধিকার করেন। পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজ্যও তিনি জয় করেন। এইভাবে বিজয়সেন সারা বাংলার একচ্ছত্র রাজা

হন। তাঁহার পুত্র বল্লালসেন ছিলেন বিদ্বান ও ধার্মিক প্রকৃতির। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রাজত্ব করেন। মগধ সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত করিয়া তিনি 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন। শেষ জীবনে লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে ভীষণ দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হয়। এই সময়ে ইক্তিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে একদল তুর্কীসৈন্য অতর্কিতে বাংলার রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করে (১২০২ খৃীঃ)। মিনহাজ-উদ্দীনের 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বক্তিয়ার মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অশ্ব ব্যবসায়ীর পরিচয়ে বিনা বাধায় নগরীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন যুদ্ধ না করিয়া নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। মিনহাজের এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য নহে। লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুর রাজধানী হইতে অন্ততঃ ১২০৫ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাংলার শেষ কীর্তিমান হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষে পাল ও সেন যুগ বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগ।

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে সমগ্র বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন বৌদ্ধাচার্যগণ। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, দীপংকর শ্রীজ্ঞান, অভয়াকরগুপ্ত প্রভৃতি। পালযুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বহু গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। তন্ত্রযান হইতে সাধারণের সুবিধার্থে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মের উৎপত্তি হয়। লুই-পা, শবর, কৃষ্ণ (কাহ্ন) প্রভৃতি সহজিয়া সাধকগণ দেশীয় ভাষায় ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন। সেইগুলি 'দোহা' বা 'চর্যাপদ' বলিয়া পরিচিত। চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

শিক্ষার প্রসারেও পাল রাজাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী (উদ্দণ্ডপুর), সোমপুর ও বিক্রমশীলা মহাবিহারগুলি বিদ্যাচর্চার মুখ্য কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ওদন্তপুরী ছিল মগধে। বিক্রমশীলা ভাগলপুর জেলায় গঙ্গাতীরে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল। সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ বিরাট ও বিচিত্র শিল্পমণ্ডিত বিহার ভারতে আর কোথাও নাই। নালন্দা মহাবিহার ছিল সমগ্র এশিয়াতে প্রসিদ্ধ। পালরাজারাও উহার পরি-

চালনার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেন নালন্দার অধ্যাপক শান্তরক্ষিত ও কমলশীল। বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ অতীশ বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতে গমন করেন ও তিয়াত্তর বৎসর বয়সে সেখানেই দেহরক্ষা করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল না। হিন্দু-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেন ও উচ্চ রাজপদে হিন্দু রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। পালযুগের তাম্রশাসনগুলি সংস্কৃত কাব্য রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পালযুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মদনপালের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিত'। এই অভিনব কাব্যের প্রতিটি শ্লোক দ্ব্যর্থবোধক। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই যুগে প্রসিদ্ধিলাভ করেন মাধব, চক্রপাণিদত্ত প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিত। বাঙালীর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রমাণ পাওয়া যায় দার্শনিক শ্রীধর ভট্ট এবং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ভট্টভবদেব ও জীমূতবাহনের রচনায়। পালযুগে শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রে,—স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে বাঙালী শিল্পীরা এক নূতন বলিষ্ঠ রীতির প্রবর্তন করেন। এই কার্যে দুই শিল্পী ধীমান ও বিৎপালোর বিশেষ অবদান ছিল।

সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন হয়। বেদচর্চা ও হিন্দু শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠনের জন্য অন্য অঞ্চল হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। রাজ্যের নানা স্থানে তাঁহারা মন্দির নির্মাণ ও দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পালযুগে প্রবর্তিত শিল্পরীতি সেনযুগে আরও উৎকর্ষ লাভ করে। বিজয়সেন ও বল্লালসেন ছিলেন সদাশিবের উপাসক। কিন্তু লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁহার আগ্রহে বাংলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মের খুব প্রসার হয়। এই যুগের বহু সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যে অসামান্য সৃষ্টির জন্য সেনযুগকে বাংলার 'সুবর্ণ যুগ' বলা হয়। সেনরাজাগণ ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। বল্লালসেন স্বয়ং 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইটি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিতেন উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্ধন, শরণ ও জয়দেব। জয়দেবের সুললিত ছন্দের কাব্যগ্রন্থ 'গীতগোবিন্দ' আজও সর্বত্র সমাদৃত হয়।

ঘ. দক্ষিণ ভারত—চালুক্য ঃ কর্ণাটে কানাড়ী-ভাষী অঞ্চলে চালুক্য রাজ্যের উদ্ভব হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে। বিজাপুর জেলায় বাতাপি বাদামি) নগরী হয় তাহাদের রাজধানী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশিন্। তাঁহার পুত্রদ্বয় কীর্তিবর্মন ও মঙ্গলেশ রাজ্যবিস্তার

করিয়া চালুক্য শক্তির প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশিন্ চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা (৬১০—৪২ খ্রীঃ)। তাঁহার পরাক্রমে কলিঙ্গ, কাঞ্চী, চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। গোদাবরী জেলার পিষ্টপুর রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনকে তিনি শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের প্রতাপশালী সম্রাট হর্ষবর্ধনকে নর্মদা তীরের যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন পুলকেশিন্। পল্লবদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় তখন হইতেই। পরবর্তী দুই শত বৎসর চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষ চলিতে থাকে। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন পুলকেশিনের নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইলে চালুক্য রাজ্য নর্মদা হইতে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশিনকে পর পর তিনবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শেষ যুদ্ধে পুলকেশিন্ নিহত হইলে তিনি চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করিয়া 'বাতাপিকোন্ড' (বাতাপিবিজয়ী) আখ্যা লাভ করেন। কিছুদিন পর পুলকেশিনের পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য আবার নরসিংহবর্মনকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দুই পক্ষে যুদ্ধ অবিরাম চলিতেই থাকে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৪—৪৫ খ্রীঃ) পুনর্বার পল্লবদিগকে পরাস্ত করিয়া কাঞ্চী নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র কীর্তিবর্মন (৭৫৭ খ্রীঃ)। তাহার ফলে চালুক্য বংশের পতন হয় এবং সূচিত হয় রাষ্ট্রকূট শক্তির অভ্যুদয়।
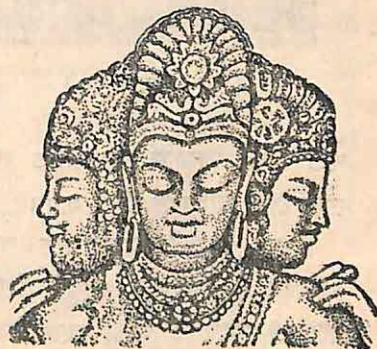
চালুক্য রাজগণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের উপাধি ছিল 'পরম ভাগবত'। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাঁহারা ছিলেন উদার মতাবলম্বী। হুয়েন সাঙ্ চালুক্য রাজ্যে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও চালুক্যদের অবদান উল্লেখযোগ্য। অজন্তার কয়েকটি বিখ্যাত গুহাচিত্র চালুক্যযুগে অঙ্কিত হয়। রেখা ও রঙের বিন্যাসে সেগুলি ভারতীয় চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন। বোম্বাইয়ের সন্নিকটে এলিফ্যাণ্টা

তিনমুখ বিশিষ্ট শিবের মূর্তি

গুহার শিবের তিনমুখ বিশিষ্ট মূর্তিটিও এই যুগের। চালুক্য রাজাদের উৎসাহে রাজধানী বাতাপি এবং পট্টদকল ও আইহোল নগরীতে বহু সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলিতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দুই স্থাপত্য-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পল্লব : কাঞ্চীর পল্লববংশ দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন রাজবংশ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে এই রাজ্যের উদ্ভব হয়। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে রাজা সিংহবিষ্ণু সুদূর দক্ষিণে চের, চোল, পাণ্ড্য এবং সিংহল রাজ্য জয় করিয়া পল্লব রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য শুরু হয় কর্ণাটের চালুক্য রাজ্যের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে কাহিনী তোমরা পড়িয়াছ। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের প্রচণ্ড আঘাতে দ্বিতীয় নন্দীবর্মন পরাস্ত হইলে কাঞ্চী নগরীর পতন হয়। পল্লবদিগের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণের রাজাগুলিও প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে নবম শতাব্দীতে পল্লবরাজ অপরাজিত আদিত্য চোলের হস্তে পরাজিত হইলে পল্লব রাজ্য চোল অধিকারে চলিয়া যায়।

রথমন্দির (মামল্লপুরম)

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পল্লবদিগের অবদান যুগান্তকারী বলা যায়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন মহামল্ল ছিলেন প্রকৃত শিল্পানুরাগী। মাদ্রাজের সন্নিকটে সমুদ্র উপকূলে মহাবলীপুরমের মন্দিরগুলি নির্মিত হয় তাঁহারই সময়ে। তাঁহারই নামানুসারে এই মন্দির নগরীর নাম হয় মহামল্লপুরম্ বা মামল্লপুরম্। মহাবলীপুরমে এক একটি পাথর কাটিয়া মন্দির নির্মাণের যে রীতি প্রবর্তন হয়, তাহাই দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর প্রথম সোপান। এইগুলি দেখিতে এক একটি রথের মত। সেইজন্য তাহাদের বলা হয় ধর্মরাজ রথ, অর্জুন রথ, দ্রৌপদী রথ ইত্যাদি। পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে যে বিরাট 'গোপুরম' (সিংহদ্বার) দেখা যায়, তাহারও উৎস

মামল্লপুরমের রথগুলি। কাঞ্চীপুরমের কৈলাশনাথ মন্দির পল্লব শিল্প-রীতির আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভাস্কর্যেও পল্লবদের অনন্য সৃষ্টি ভারতীয় শিল্পের সম্পদ। মন্দিরগুলির দেওয়ালে দেখা যায় অসংখ্য মূর্তি ও সূক্ষ্ম কারুকার্য। মহাবলীপুরমের পর্বতগাত্রে রূপায়িত হইয়াছে মহিষাসুর বধ, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি কাহিনীচিত্র, যাহা আজও দর্শকদের বিস্মিত করে।

পল্লব রাজ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। রাজা মহেন্দ্রবর্মন প্রথম জীবনে জৈন ও ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে শৈবধর্মে আকৃষ্ট হন। শৈব 'নায়নার্' ও বৈষ্ণব 'অলবার' সাধক সম্প্রদায়ের প্রভাবে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি তামিল ভাষার সম্পদ। সংস্কৃত ভাষার চর্চাও পল্লবযুগের একটি বৈশিষ্ট্য। 'কিরাতার্জুনীয়' রচয়িতা ভারবি এবং 'দশকুমারচরিত' লেখক দণ্ডিন্ পল্লব রাজসভা অলংকৃত করিতেন।

চালুক্য রাজ্যের পতনে অষ্টম শতাব্দীতে যে রাষ্ট্রকূট রাজ্য গড়িয়া উঠে সেই বংশের রাজারাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাশ মন্দিরটি নির্মিত হয় রাষ্ট্রকূট প্রথম কৃষ্ণের উৎসাহে। ইহা একটি পাথর হইতে খোদাই করা। বৃহদায়তন মন্দিরটি অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত। বহু দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া ইহার দেওয়ালে আছে চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন।

চোল রাজ্যঃ সুদূর দক্ষিণের চোলরাজ্য অতি সুপ্রাচীন। অশোকের সময়ে ইহা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চোল রাজ্য পল্লবদের অধীন হইয়া যায়। নবম শতাব্দীতে আদিত্য চোল পল্লব নৃপতি অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া চোল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। চোল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহান্ রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খৃীঃ)। উত্তরে তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের অধিপতি হল রাজরাজ। কেরল, পাণ্ড্য, গঙ্গ, চালুক্য, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যগুলি তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। সিংহলে দ্বীপের উত্তরাঞ্চল এবং ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপপুঞ্জও তিনি জয় করিয়াছিলেন।
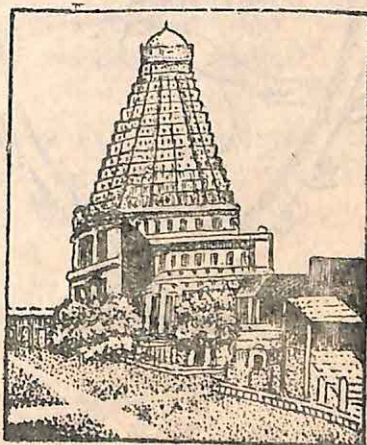
রাজরাজেশ্বর মন্দির (তাঞ্জোর)

রাজরাজ শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিখ্যাত নন, তিনি ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঞ্জোরের সুবৃহৎ রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির রাজরাজেরই কীর্তি। শৈব হইলেও ধর্মবিষয়ে তিনি ছিলেন উদার। তাঁহার অনুমতিক্রমে সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা তাঁহার রাজ্যে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করান।

রাজরাজের সুযোগ্যপুত্র পরকেশরিবর্মন রাজেন্দ্র চোলের কৃতিত্ব পিতার চেয়ে অধিক। রাজেন্দ্র (১০১২-৪৪ খৃীঃ) ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বহু রাজ্য জয় করিয়া চোল সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের সকল রাজাই তাঁহার পদানত হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যবাহিনী গাঙ্গেয় উপত্যকায় দণ্ডভুক্তি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গাল এবং গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 'গঙ্গাইকোণ্ড' (গঙ্গাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার অপর কৃতিত্ব সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজার বিরুদ্ধে নৌ-বাহিনী প্রেরণ। নৌ-অভিযানের ফলে সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপসহ বহু রাজ্য তাঁহার অধিকারে আসে। ইহার পূর্বে আর কোন ভারতীয় রাজা সাগর পারে এইরূপ বিজয় অভিযান করেন নাই।

নটরাজ মূর্তি

সারা জীবন সমরাভিযানে ব্যস্ত থাকিলেও রাজেন্দ্র প্রজাদের কল্যাণ কর্মে অবহেলা করিতেন না। গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম নামে একটি নূতন নগরী গড়িয়া সেইখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার সন্নিকটে খনন করান চোলগঙ্গম নামে একটি বিরাট জলাশয়, কৃষিক্ষেত্রে সেচকার্যের জন্য। চোল শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা।

পল্লবযুগে যে দ্রাবিড় শিল্প-রীতি প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা চরমোৎকর্ষ লাভ করে চোল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়। রাজরাজ নির্মিত চৌদ্দতল বিশিষ্ট

রাজরাজেশ্বর (বৃহদীশ্বর) মন্দিরটি উচ্চতায় ছিল ১৯০ ফিট (৫৭·৯১ মিটার)। অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি মন্দির গাত্রের শোভা বর্ধন করিতেছে। নন্দীমণ্ডপে একটি পাথর হইতে খোদাই করা বিরাট বৃষের মূর্তিটি দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোন্ডচোলপুরমে ১৬০ ফিট (৪৮·৭৭ মিটার) উচ্চ আর একটি শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভাস্কর্যেও চোল শিল্পীদের অবদান ভারতীয় শিল্পের অমূল্য সম্পদ। পাথরের মূর্তি ছাড়া ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি ভাব ও ভঙ্গিমার লালিত্যে অপূর্ব। চোল শিল্পীর দক্ষতায় ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তিগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রাণোচ্ছল সজীবতা ও গতিচ্ছন্দ। চোল স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই অসামান্য উৎকর্ষের কৃতিত্ব চোল সম্রাটদের।

অনুশীলনী

ক

১। হূণ জাতি কোথা হইতে আসিয়াছিল? কখন তাহারা প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং তাহার কি পরিণতি হইয়াছিল।

২। তোরমান ও মিহিরকুল সম্বন্ধে কি জান? হূণগণ কিভাবে ভারতীয় জনজীবনে মিশিয়া যায়?

৩। হর্ষবর্ধন কি ভাবে কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন? তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন কেন? তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল' তাঁহাকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলা হয় কেন?

৪। হুয়েন সাঙ কে ছিলেন? তাঁহার বিবরণীতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে তিনি কি লিখিয়াছেন? সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থার কি বর্ণনা পাওয়া যায়?

খ

৫। গুর্জর প্রতীহারগণ কিভাবে ও কখন উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করে? তাহাদের সহিত কোন্ কোন্ রাষ্ট্র শক্তির যুদ্ধ হয়? কনৌজে তাহাদের স্থায়ী রাজধানী কবে ও কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়?

গ

৬। শশাঙ্ক কে ছিলেন? তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল? রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি কি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাহা কতটা সফল হইয়াছিল?

৭। বাংলাদেশের পাল রাজবংশের উৎপত্তি কিভাবে হয়? ধর্মপাল কিভাবে কনৌজের অধিকার লাভ করেন? দেবপালের সহিত কোন্ বিদেশী রাজা মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন? পাল বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা কে ছিলেন?

৮। বিজয়সেনকে সেনরাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কে নদীয়া আক্রমণ করে?

৯। পাল ও সেনযুগের শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

১০। চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষ কতদিন চলিয়াছিল? তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

১১। শিল্পকলা ও সাহিত্যে পল্লবযুগের অবদান কি?

১২। চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁহার কৃতিত্বের কথা কি জান? রাজেন্দ্র চোল সাগর পারে কোথায় অভিযান করেন?

১৩। সংক্ষেপে লিখ—শ্বেত হূণ, রাজ্যশ্রী, বাণভট্ট, নালন্দা, চক্রায়ুধ, প্রতীহার, মহেন্দ্রপাল, 'মাৎস্যনায়', কৈবর্ত বিদ্রোহ, তবকাৎ-ই নাসিরি, চর্যাপদ, বিক্রমশীলা বিহার, সোমপুর বিহার, অতীশ দীপঙ্কর, শান্তরক্ষিত রামচরিত, চক্রপাণিদত্ত, ধীমান ও বিৎপালো, বল্লালসেন, কবি জয়দেব, 'বাতাপি কোণ্ড', সিংহবিষ্ণু, মামল্লপুরম, গোপুরম্, নায়নার্ ও আল্বার সম্প্রদায়, রাজরাজেশ্বর মন্দির, গঙ্গাইকোণ্ড, ইলোরার কৈলাস মন্দির।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ

প্রাচীনকাল হইতেই মূলতঃ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তথাপি ভারত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত বরাবর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে। কত বিদেশী জাতি যুগে যুগে ভারতে আসিয়াছে। ভারতের ধর্ম ও সভ্যতাও পরিবেশিত হইয়াছে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে। এই আদান প্রদান চলিয়াছে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার গিরিপথ ভেদ করিয়া স্থলপথে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হইতে সুদূর চীন জাপান পর্যন্ত এবং সমুদ্রপথে সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অঞ্চলে।

পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া: পারস্য সম্রাট দারায়ুস ও গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব যুগে। মৌর্য সম্রাট অশোকের চেষ্টায় ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীর বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

আবার কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সময়ে মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলি হইয়া উঠে ভারতীয় সভ্যতার এক একটি কেন্দ্র। তখন হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও শিল্পকলা সমগ্র মধ্য এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, গড়িয়া উঠে ভারতীয়দের ছোট ছোট উপনিবেশ। কালক্রমে সেগুলি মরুভূমি গ্রাস করে। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে স্যার অরেলস্টাইন্ নামে এক বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের খননকার্যের ফলে তাক্লামাকান মরু অঞ্চলে একাধিক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে বৌদ্ধ স্তূপ, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ও পুঁথিপত্র। খোটানে পাওয়া যায় ভারতীয়দের উপনিবেশ নগরীর ধ্বংসাবশেষ। পরবর্তী কালে ফা হিয়েন ও হুয়েন সাঙ্ও খোটান নগরীর বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণীতে। মধ্য এশিয়ার এই সকল কেন্দ্র হইতেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু চীনা ভিক্ষু খোটানের ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকটে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। হুয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ শেষে খোটানে কিছুদিন বাস করেন।

তিব্বত: হিমালয়ের অন্তর্গত তিব্বত উপত্যকার সহিত ভারতের যোগাযোগের কথা প্রাচীন তিব্বতী বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা স্রং-সান্ গাম্পোর রাজত্বকালে। তিনি নেপালের এবং চীনের রাজবংশে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই রাণীই ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁহাদের প্রভাবে রাজা বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হন। তখন হইতেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয়, নির্মিত হয় বহু মঠ ও মন্দির। বিখ্যাত 'রা-মো-চে' বিহারটিও স্রং-সানের কীর্তি। তাঁহারই আগ্রহে তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা ও গুপ্ত যুগের ভারতীয় লিপির অনুসরণে তিব্বতী লিপির প্রচলন হয়। বহু বৌদ্ধ গ্রন্থেরও তিব্বতী অনুবাদ করা হয়। পরবর্তী কালেও অনেক তিব্বতী পণ্ডিত নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যয়ন করিতে আসেন। শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল প্রমুখ বৌদ্ধ আচার্যগণও গিয়াছেন তিব্বতে। তিব্বতের লামাধর্ম শান্তরক্ষিতের অবদান। একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে স্মরণীয় হইয়া আছেন বাংলার পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ। আজও তিব্বতের লামাধর্ম, অসংখ্য গুম্ফা (গুহা মন্দির) ও সযত্নে রক্ষিত পুঁথিপত্র ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়।

সুবর্ণভূমি: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অঞ্চল প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবাসীর নিকট 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত। এখানকার রান্নার মশলা ও গন্ধদ্রব্য আর ধনরত্নের সন্ধানে দুর্জয় সাহসী ভারতীয় নাবিকগণ বিপদসঙ্কুল

বঙ্গোপসাগর হেলায় অতিক্রম করিত। এইরূপ অভিযানের বহু কাহিনীর উল্লেখ আছে বৌদ্ধ জাতকে ও কথাসরিৎ-সাগরের গল্পমালায়। খ্রীষ্টীয়

বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও উপনিবেশ

প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য বন্দর হইতে পণ্যবাহী নৌকার নয়মিত যাতায়াত ছিল মালয়, জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম ও ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে।

বাণিজ্য উপলক্ষে যাইয়া অনেক ভারতীয় ঐসব দেশে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকে, গড়িয়া উঠে ভারতীয় উপনিবেশ। তখন ঐসব অঞ্চলে সভ্যতা বলিতে প্রায় কিছুই ছিল না। উপনিবেশগুলি হইয়া উঠে এক একটি হিন্দু রাজ্য। এজন্য সমগ্র অঞ্চলই 'বৃহত্তর ভারত' বলিয়া অভিহিত হইত।

কম্বুজ: খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইন্দোচীনে দুইটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল—কম্বুজ (কাম্বোডিয়া) এবং চম্পা (আনাম বা ভিয়েৎনাম)। কথিত আছে, কৌণ্ডিণ্য নামে এক ভারতীয় ক্ষত্রিয় স্থানীয় নাগবংশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া কম্বুজ রাজ্য স্থাপন করেন। চীনা বৃত্তান্তে আধুনিক কাম্বোডিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের এই রাজ্যটিকে 'ফুনান' বলা হয়। ইহাই প্রথম হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা জয়বর্মন সমগ্র কাম্বোডিয়ার অধিপতি হন। কাম্বুজ সাম্রাজ্যের বিস্তারে ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যেরও প্রসার হয়। বহু শিলালিপি ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দির গড়িয়া উঠে। রামায়ণ, মহাভারত ও সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠনও প্রচলিত হয়। নবম শতাব্দীতে রাজধানী যশোধরপুর (আঙ্কোরথম)-এর প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় জয়বর্মন। দ্বাদশ শতাব্দী কম্বুজের ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। রাজা সূর্যবর্মনের উৎসাহে রাজধানী আঙ্কোরে গড়িয়া

আঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দির

উঠে একাধিক সুউচ্চ ও বৃহদায়তন মন্দির। তাহাদের মধ্যে আঙ্কোরভাট বিষ্ণু মন্দির স্থাপত্য শিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন। ত্রিতল মন্দিরের প্রতিটি তলে উৎকীর্ণ আছে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি ও পৌরাণিক কাহিনী। ২১৩

ফিট (৬৪·৯৩ মিটার) উচ্চ বিশাল মন্দিরটির গঠন নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের জন্য ইহাকে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য বলা হইয়া থাকে। রাজধানীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ১৫০ ফিট (৪৫·৭২ মিটার) বায়নের উচ্চ শিব মন্দিরটিও হিন্দু শিল্প-রীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রাজধানী যশোধরপুর বা অঙ্কোরথমের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন কম্বুজের শেষ কীর্তিমান সম্রাট সপ্তম জয়বর্মন (১১৮১—১২৪৩ খৃীঃ)। দুই বর্গ মাইলব্যাপী নগরীর পাঁচটি সিংহদ্বার ছিল। প্রত্যেক তোরণ হইতে প্রশস্ত রাজপথ আসিয়া মিলিত হইত নগরীর কেন্দ্রস্থলে। নগর নির্মাণের ইহা এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সপ্তম জয়বর্মনের পর ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণে কম্বুজ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সুমাত্রা ঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় নামে একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠে। ইহার রাজধানী ছিল শ্রীবিজয় (পালেমবাং)। সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীবিজয় রাজ্য মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দুর্ধর্ষ নৌ-বাহিনীই ছিল তাহাদের প্রাধান্যের কারণ। ভারতের উপকূলে তাহাদের বাণিজ্যতরী নিয়মিত যাতায়াত করিত। চীন পরিব্রাজক ইৎসিঙ্ এখানে বহু মঠ ও বিহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

জাভা ঃ যবদ্বীপ বা জাভার উল্লেখ রামায়ণে আছে। প্রাচীনকালেই ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল যবদ্বীপে। পূর্ণবর্মন নামে একজন রাজা পশ্চিম যবদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের শাসনে মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ বলিদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি লইয়া একটি শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্য গঠিত হয়। শৈলেন্দ্রগণ প্রথমে যবভূমি বা যবদ্বীপের রাজা ছিলেন। পরে সমগ্র অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করিয়া 'মহারাজা' এবং 'সুবর্ণ-দ্বীপাধিপতি' উপাধি ধারণ করেন। শৈলেন্দ্র রাজাদের ছিল সুশিক্ষিত নৌ-বাহিনী। একদিকে চীন ও অপরদিকে ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য চলিত। বৈদেশিক বাণিজ্যই ছিল তাহাদের সমৃদ্ধির মূল।

শৈলেন্দ্র রাজাগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বাংলার বৌদ্ধ শ্রমন কুমারঘোষ ছিলেন তাঁহাদের গুরু। এই বংশেরই মহারাজ বালপুত্রদেবের আগ্রহে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। নিজ রাজ্যেও বহু মঠ ও মন্দির তাঁহারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বরবুদুর আজও তাঁহাদের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। বরবুদুরের জগদ্বিখ্যাত স্তূপ-

মন্দিরটির পরিকল্পনা যেমন বিশাল, তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যও তেমন অভিনব। পাহাড়ের উপরের মন্দিরটি নির্মিত হয় ধাপে ধাপে নয়তলা উঁচু করিয়া। উপরে তলাগুলি ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্বোপরি আছে একটি

বরবুদুর (যবদ্বীপ)
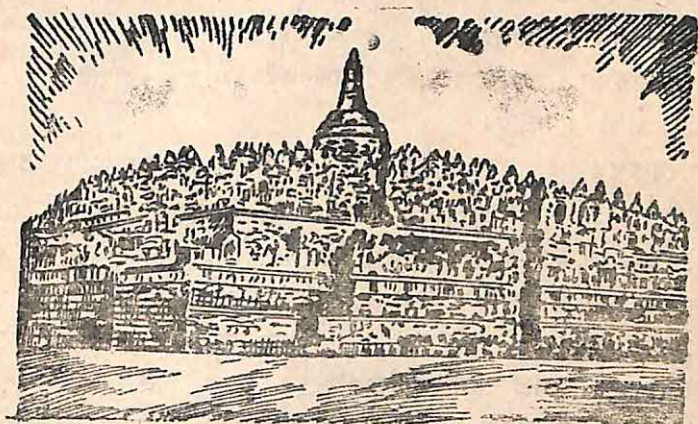
ঘন্টাকৃতি স্তূপ। নীচের প্রতি তলার চারিদিকে ঢাকা বারান্দার দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ও জাতকের গল্প, কিন্তু উপরের তিনটি তলায় আছে ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত স্তূপের সারি। তাহার ভিতরে আছে ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি। সর্বোচ্চ স্তূপটি সম্পূর্ণ শূন্য। উহা বৌদ্ধধর্মে সিদ্ধিলাভের প্রতীক। সারা পৃথিবীতে এইরূপ বিশাল আয়তনের মন্দির দ্বিতীয় নাই।

একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্রের আক্রমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের প্রতিপত্তি কমিয়া আসে এবং তাহাদের পতন শুরু হয়।

ব্রহ্মদেশ ঃ ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বৃত্তান্তে কথিত আছে, কপিলাবস্তুর কোন এক রাজকুমার উত্তর ব্রহ্মে ও আরাকানে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেন। পরে নিম্নাচলে প্রোমের নিকটে শ্রীক্ষেত্র (সিকসেৎ) হয় তাহাদের রাজধানী। তাম্রলিপ্ত হইতে জলপথে সরাসরি শ্রীক্ষেত্রের সহিত যোগাযোগ ছিল। ভারতীয়দের প্রভাবে মন, পিউ প্রভৃতি আদিবাসীরাও হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া যায়। নবম শতাব্দী পর্যন্ত পিউ জাতির এই অঞ্চলে খুব প্রতিপত্তিশালী ছিল। পরে দক্ষিণের মৃন্ম (ব্রহ্ম) জাতি পাগান নগরীকে রাজধানী করিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলে। একাদশ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের রাজা অনিরুদ্ধের চেষ্টায়

হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্য ব্রহ্মদেশে প্রচলিত হয়। এখনও হীনযান ব্রহ্মবাসীদের প্রধান ধর্ম। ব্রহ্মের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থায় ভারতীয় প্রভাব আজও বিদ্যমান। পাগান রাজাদের উৎসাহে অসংখ্য বৌদ্ধ প্যাগোডা নির্মিত হয়। তাহাদের মধ্যে 'আনন্দ মন্দির'টি ভারত-ব্রহ্ম স্থাপত্য-রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বুদ্ধদেবের একটি বিরাট মূর্তি আছে। তাহার উচ্চতা ৩২ ফিট বা সাড়ে নয় মিটার।

সিংহল ঃ ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সিংহল বা শ্রীলঙ্কার সহিত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালে হইতেই। রামায়ণে স্বর্ণলঙ্কার বৈভবের বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীতে আছে সিংহলে বাণিজ্যিক অভিযানের উল্লেখ। সিংহলী গ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশে লিখিত হইয়াছে যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। (কথিত আছে, সিংহল-ভারত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বাংলার রাজপুত্র বিজয়সিংহের লঙ্কা বিজয়ে।) অশোকের সমসাময়িক সিংহলরাজ দেবানাম্পিয় তিস্স নাকি ছিলেন বিজয়সিংহের বংশধর। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে (মতান্তরে ভ্রাতা ও ভগ্নী) সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। গয়ার বোধিবৃক্ষের একটি শাখাও তিনি পাঠান। তাহা এখনও অনুরাধপুরে আছে। দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যের সহিত সিংহলের বৈবাহিক সম্পর্কও যেমন স্থাপিত হইয়াছিল, বহু সঙ্ঘর্ষও তেমন ঘটিয়াছিল। ইলার নামে একজন চোল নায়ক সিংহল দখল করিয়া প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। দ্বীপরাজ্য বিদেশী কবল হইতে মুক্ত করেন রাজা দুট্‌ঠগামিনী। আবার চোলরাজ করিকালের অভিযানে সিংহল বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রাজা গজবাহুর সময়ে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য প্রভাবিত করিয়াছে সিংহলীদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি।

অনুশীলনী

১। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলিতে কিভাবে ভারতীয়, সভ্যতার প্রসার হয়? মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কি কি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে? সেগুলি কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

২। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে বিস্তার লাভ করে? তিব্বতী লিপি কোন্ লিপির মত? তিব্বতে বৌদ্ধধর্মর প্রচারের জন্য বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্যদের নাম লিখ।

৩। কোন্ অঞ্চল 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত? কি ভাবে ঐ সব অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে?

৪। কম্বুজ রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন? এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান লিখ।

৫। আঙ্কোরভাট মন্দিরকে পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য বলা হয় কেন?

৬। শৈলেন্দ্ররাজগণের আমলে স্থাপত্য শিল্পের যে চরম উন্নতি হইয়াছিল তাহা উদাহরণ দিয়া আলোচনা কর।

৭। সংক্ষেপে লিখ ঃ—খোটান, স্রং-সান-গাম্পো; শান্তরক্ষিত, ফুনান্, বৃহত্তর ভারত, যশোধরপুর, শ্রীবিজয়, পূর্ণবর্মন, আনন্দ মন্দির, দেবনাম্পিয় তিস্স।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ (ক) প্রত্নতাত্ত্বিক স্টাইন — এর খননকার্যের ফলে — মরু অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন নগরীর —। (খ) হুয়েন সাঙ ভারত ভ্রমণ শেষে — কিছু দিন বাস করেন। (গ) তিব্বতের রাজার — ছিল দুই রাণী, একজন — আর একজন — রাজকুমারী। (ঘ) ইন্দোচীনে দুইটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল; — এবং —। (ঙ) — স্তূপ মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে — তলা উঁচু।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতের সুলতানী যুগ (১২০৬—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

(ক) তুর্কী-আফগান জাতির ভারতে রাজ্যবিস্তার—সুলতান মাহমুদ ঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে সিন্ধুদেশে একজন ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা দাহির রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ বিন্ কাশিমের নেতৃত্বে আরব বাহিনীর অভিযানে তিনি পরাজিত ও নিহত হন (৭১২ খৃঃ)। ভারতে মুসলমান শাসনের ইহাই প্রথম সোপান। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজপুতনা ও গুজরাট অঞ্চলের রাজ্যগুলির দৃঢ় প্রতিরোধের ফলে আরব রাজ্য আর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। সিন্ধু বিজয়ের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে গজনীতে নূতন তুর্কী রাজ্যের উদ্ভব হইলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। গজনীর সুলতান সবুক্তগীন ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে প্রায়ই হানা দিয়ে লুণ্ঠন করিতেন। পাঞ্জাব ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিপতি শাহী জয়পাল তাহার নিকট পরাজিত হন এবং পেশোয়ার সীমান্ত পর্যন্ত

সবুক্তিগীনের হস্তগত হইয়া যায়। সবুক্তগীনের পর তাঁহার পুত্র সুলতান মাহমুদ বিধর্মী হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেন ও একের পর এক রাজ্য তাঁহার সমরাভিযানে বিধ্বস্ত হইতে থাকে। হিন্দু মঠ ও মন্দির ধ্বংস করা তাঁহার নিকট পবিত্র কর্ম ছিল। প্রায় প্রতি বৎসর তাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনী ভারতের কোন না কোন রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মাহমুদের অভিযানে উত্তর ভারত জর্জরিত হইয়াছিল। ভারতীয় রাজাদের কাছে তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিভীষিকা। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার বিধ্বংসী আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি তখনকার ভারতীয় রাজাদের ছিল না। সেইজন্য বিচক্ষণ সুলতান ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস ও ধনরত্ন লুণ্ঠনই করিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র শাহীরাজ্য পাঞ্জাব তিনি নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ভবিষ্যতে ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপনে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সুলতান মাহমুদ

মুহম্মদ ঘুরী ঃ সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজনী সাম্রাজ্যের পতনে আফগানিস্থানের ঘুর রাজ্য প্রধান্য লাভ করে। মুহম্মদ ঘুরী হন গজনী ও কাবুলের শাসনকর্তা। ভারতে রাজপুত রাজ্যগুলি তখন পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত। সেই সুযোগে তিনি আজমীড় ও দিল্লীর অধিপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজ জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু পর বৎসর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কূটকৌশলী মুহম্মদ পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া (১১৯২ খ্রীঃ) আজমীড় ও দিল্লী অধিকার করিলেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়চন্দ্র পরাজিত হইলে কনৌজও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং মুহম্মদ ঘুরী দিল্লীর সম্রাট হন (১২০৩ খ্রীঃ)। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ নিহত হইলে দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হইলেন কুতুবুদ্দীন আইবাক।

দাস সুলতান বংশ ঃ কুতুবুদ্দীন (১২০৬-১০ খ্রীঃ) নিজে ছিলেন মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। পরবর্তী সুলতান ইলতুৎমিস ও গিয়াসুদ্দিন্ বল্‌বনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের দাসবংশীয় সুলতান বলা হয়। কুতুবুদ্দীন রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা রাজ্য সুরক্ষিত করাই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। এজন্য তিনি একটি সুরক্ষিত সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। দিল্লী উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ কুতুবমিনার তাঁহার অন্যতম কীর্তি। কুতুবুদ্দিনের পর সুলতান হন তাঁহার জামাতা ইলতুৎমিস (১২১০-৩৬ খ্রীঃ)। সারা জীবন তাঁহাকে নানা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকিতে হয়। একে একে সকল সমস্যার সমাধান
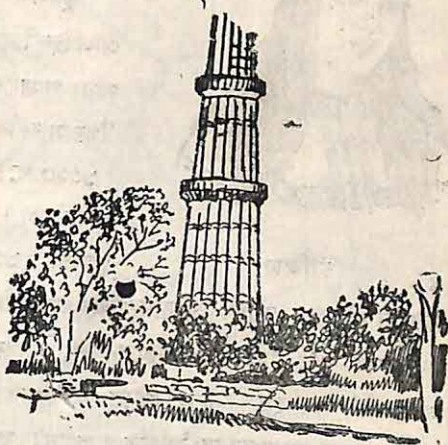
কুতুবমিনার

করিয়া তিনি তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে ইলতুৎমিস তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান। তাঁহার শিক্ষা এবং যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু ওমরাহগণের চক্রান্তে তাঁহার মৃত্যু হয় (১২৪০ খ্রীঃ)। অতঃপর কয়েকজন অকর্মণ্য সুলতান কিছুদিন রাজত্ব করেন। প্রকৃত শাসনকার্য চালাইতেন উজীর (মন্ত্রী) উলুঘ্ খাঁ। অবশেষে তিনি গিয়াসুদ্দীন বলবন্ নামে দিল্লীর সুলতান হন। শাসনকার্যে কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায়।

খিলজী বংশ ঃ বলবনের মৃত্যুর পর খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান জালালুদ্দিন খিল্‌জী (১২৯০ খ্রীঃ)। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীন খিলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি প্রায় সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়াছিলেন। তিনি নিজেকে আলেকজাণ্ডারের মত দিগ্বিজয়ী মনে করিতেন। 'দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার' উপাধিও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাট, রণথম্বর, মেবার, মালব, উজ্জয়িনী, ধারা ও মান্ড প্রভৃতি অঞ্চল তিনি

অধিকার করেন। দক্ষিণ ভারতে তাঁহার অভিযানে নেতৃত্ব করেন তাঁহার সেনাপতি মালিক কাফুর। দেবগিরি, বরঙ্গল, হোয়সল এবং সুদূর দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্যও তিনি জয় করেন। সম্রাট অশোকের পরে আলাউদ্দীনের মত সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে আর কেহ সক্ষম হয় নাই।

রাজিয়া

তুঘলক বংশঃ ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যুর মাত্র চারি বৎসর পরে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজীমালিক 'গিয়াসুদ্দীন তুঘলক' নামে সুলতান হন (১৩২০ খ্রীঃ)। তিনিই তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ) বহু সদগুণের অধিকারী হইলেও ভীষণ একরোখা অহঙ্কারী ছিলেন। শাসনব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে যেসব কাজ তিনি করিয়াছিলেন তাহা সময়োচিত হয় নাই। ফলে তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত শাসন করার অসুবিধা হইত। এজন্য সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত লইয়া দিল্লীর

মুহম্মদ বিন তুঘলক

আলাউদ্দিন খিলজী

সকল নাগরিককে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) যাইতে বাধ্য করেন। দিল্লী নগরী জনশূন্য ও অরক্ষিত দেখিয়া মোঙ্গলগণ অবাধে লুঠপাট করিতে থাকে। ফলে মুহম্মদকে রাজধানী পুনরায় দিল্লীতে ফিরাইয়া আনিতে হয়। রাজকোষে অর্থাভাব পূরণ করার জন্য মুহম্মদ আবার এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সোনা-রুপার বদলে তামার মুদ্রা প্রচলন করিলেন। অথচ মুদ্রা জাল করার বিরুদ্ধে কোন সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না। জাল তাম্রমুদ্রায় বাজার
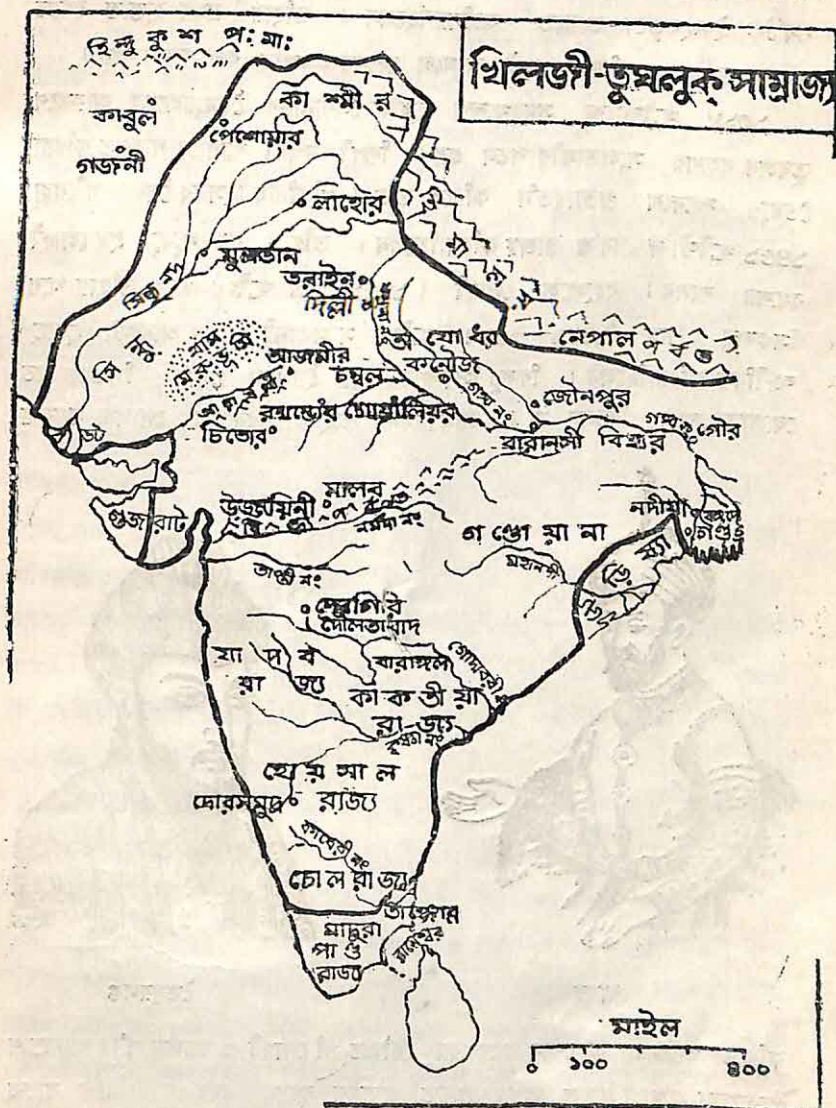
ছাইয়া গেল। তখন বাধ্য হইয়া তাম্রমুদ্রা বাতিল করিতে হইল। তাঁহার অদূরদর্শিতার ফলে রাজকোষ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল। বীর যোদ্ধা ও প্রতিভাবান হইলেও মুহম্মদ ছিলেন অবিবেচক, তাহার অধীরতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যই

তাঁহার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এজন্য অনেকে সেই বিচিত্র চরিত্র সুলতানকে 'পাগলা রাজা' অপবাদ দিয়া থাকে। মুহম্মদের রাজত্বকালে মরক্কোবাসী পর্যটক ইবনবতুতা ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে মুহম্মদ তুঘলকের চরিত্র ও সেই আমলে দেশের অবস্থার কথা জানা যায়।

১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সমরখন্দের দুর্ধর্ষ সেনানায়ক তৈমুরলঙের আক্রমণে তুঘলক বংশের সুলতানীর পতন হয়। দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত করিয়া তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে সৈয়দবংশীয়েরা ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর শুরু হয় লোদী বংশের শাসন। বহলুল লোদী (১৪৫১—৮৯ খ্রীঃ) এবং তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ (১৪৮৯—১৫১৭ খ্রীঃ) সুলতানী শাসন অনেকটা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদী পিতার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। আমীরগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র

বাবর তৈমুরলঙ

করিতে থাকে। অবশেষে পাঞ্জাবের দৌলত খাঁ লোদী ও আলম খাঁর আমন্ত্রণে কাবুলের মঙ্গোল নায়ক বাবর ভারত আক্রমণ করেন এবং পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। তুর্কী পাঠান সুলতানীর অবসানে অভ্যুদয় হইল ভারতে মুঘল রাজত্বের।

(খ) **সুলতানী যুগে ধর্ম, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ঃ** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সময় হইতেই দেখা গিয়াছে যে, হিন্দু দেবদেবীর

মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করা এবং হিন্দুদের জোর করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাই ছিল তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। দিল্লীর তুর্কী ও আফগান সুলতানগণ ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও উগ্র হিন্দু বিদ্বেষী। এইজন্য সুলতানী যুগের প্রথম শতাধিক বৎসর হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া উঠে নাই। মুসলমানদের চক্ষে হিন্দুরা ছিল বিধর্মী কাফের মাত্র। হিন্দুরাও তাহাদের মনে করিত অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ বা যবন। হিন্দুসমাজও হইয়া উঠে কঠোর বিধিনিষেধে আবদ্ধ।

সুদীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের ফলে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব হ্রাস পাইতে থাকে। সুলতানদের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দু সংস্কৃতির গুণগ্রাহী হইয়া উঠেন। ইতিমধ্যে অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হইয়াছেন। অনেক মুসলমানও হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছেন। তাহার ফলে হিন্দুর আচার ব্যবহারও ক্রমে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুরাও অনেকে ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সরকারী কার্যে যোগদান করিয়াছে। এইভাবে মেলামেশার ফলে ধীরে ধীরে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে থাকে, সামাজিক বিধিনিষেধের কঠোরতা শিথিল হইতে থাকে। তাহা ছাড়া অনেক মুসলমান পণ্ডিত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা করেন ও সংস্কৃত বহু গ্রন্থ আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

দুই জাতির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ফল হিসাবে চতুর্দশ শতাব্দী হইতে একাধিক হিন্দু সাধক ও মুসলমান ফকির তাঁহাদের উদার মানবতাবাদী ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহাদের ধর্মের মূল কথা ছিল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই ঈশ্বর। ভগবানের কৃপা লাভের জন্য জাঁকজমক করিয়া মন্দির মসজিদ গড়িয়া পূজার্চনা করার প্রয়োজন নাই। ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ভগবানের নাম সংকীর্তন ও আত্মনিবেদনই তাঁহার কৃপালাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ভগবানে ভক্তি ও মানুষে মানুষে প্রেমই হইল প্রকৃত ধর্ম। ইহাই ভক্তিবাদ বলিয়া পরিচিত। এই সকল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মৈনুদ্দিন চিস্তি প্রমুখ মুসলমান ফকির একই প্রকার প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন। এই উদারসিদ্ধ ফকিরদের মতবাদকে সুফীবাদ বলা হয়। ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ দুই সম্প্রদায়ের মিলনের সোপান রচনা করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট ফল উর্দু

ভাষার উদ্ভব। আরবী, ফারসী হিন্দী ভাষার মিশ্রণে গঠিত হইয়াছিল উর্দু। উর্দু শব্দের অর্থ সেনাশিবির। সেনাবাহিনীতে এই মিশ্র ভাষার ব্যবহার হইত। পরে ইহা জনসাধারণের ভাষা হইয়া উঠে।

(গ) **মধ্যযুগের সাধক—কবীর** : কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিশুকালে মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমান জোলা বা তাঁতির ঘরে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই কবীর ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। সাধক রামানন্দের শিষ্যত্ব লাভ করার আগ্রহে একদিন শেষরাত্রে কবীর গঙ্গাঘাটে শুইয়া থাকেন। গঙ্গাস্নানে যাইবার সময়ে অতর্কিতে তাঁহার গায়ে পা লাগিলে রামানন্দ 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণ করেন। সেই হইতে রাম নাম হয় কবীরের ইষ্টমন্ত্র। পরে তিনি রামানন্দের দ্বাদশ প্রধান শিষ্যের অন্যতম হন।

কবীর

ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও জীবে প্রেমই কবীরের ধর্মের মূল কথা। তাঁহার নিকট মানুষ মাত্রেই এক জাতি। আল্লাহ্ বা রহিম এবং রাম ও কৃষ্ণ একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম। তিনি ছোট ছোট দুই লাইনের হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া সকলকে উপদেশ দিতেন। সেই হিন্দী পদগুলি 'কবীরের দোহা' বলিয়া পরিচিত। কবীরের উদার ধর্মমতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ দাবী করে। কিন্তু আচ্ছাদন সরাইলে দেখা যায় একগুচ্ছ ফুল, তাহারই একাংশ হিন্দুরা দাহ করে ও অপর অংশ মুসলমানরা কবর দেয়।

শ্রীচৈতন্য : সুলতান হুসেনশাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বঙ্গদেশে তিনিই ভক্তিধর্মের প্রবর্তক। তাঁহার মতে প্রেম ও ভক্তির সাহিত

ভগবানের স্মরণ লইলে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এজন্য চৈতন্যদেব প্রবর্তন করেন সমবেতভাবে হরিনাম সংকীর্তন। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত বা মূর্খ ভগবানের নাম কীর্তনে সকলের অবাধ অধিকার। ব্রাহ্মণ বা মুসলমান সকলের কাছেই তিনি অকৃপণভাবে প্রেম ধর্ম বিলাইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে আনাচারী জগাই মাধাই এবং যবন হরিদাস পর্যন্ত অগণিত নরনারী তাঁহার শিষ্যত্বলাভে ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম শচীদেবী। চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। বাল্যকালে তাঁহাকে সকলে নিমাই বলিয়া ডাকিত। অসাধারণ মেধাবী বিশ্বম্ভর কুড়ি বৎসর বয়সেই ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন, শাস্ত্রবিচারে কেহ তাঁহার সহিত পারিত না। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি গয়াধামে যান এবং সেখানে ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। শাস্ত্রচর্চা ত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া নাম সংকীর্তনে মাতিয়া উঠেন। অদ্বৈত্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার অনুরাগীদের লইয়া নবদ্বীপের পথে পথে তিনি হরিনাম করিয়া ফিরিতেন। তখনকার মুসলমান কাজীর (শাসক) শোভাযাত্রার নিষেধাজ্ঞা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। শোনা যায়, কাজী স্বপ্নাদেশ পাইয়া তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তখন হইতে তিনি বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, কাশী, বৃন্দাবন ও দাক্ষিণাত্যে ভগবৎ প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করেন। রাধাকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহার উপাস্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পুরীধামে মানবলীলা সংবরণ করেন যুগাবতার শ্রীচৈতন্য।

গুরুনানক ঃ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গুরুনানক ভক্তিমার্গী সাধকদের অন্যতম। পাঞ্জাবের শিখ্ সম্প্রদায়ের তিনিই ছিলেন প্রথম ধর্মগুরু। শিখ্ কথার অর্থ শিষ্য। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ যখন নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের ভেদাভেদে আচ্ছন্ন, নানক তখন নূতন পথের সন্ধান দেন, সেই পথ ভক্তির ও প্রেমের পথ। নানকের মতে ভগবান এক ও

অদ্বিতীয় এবং তিনি নিরাকার জ্যোতির্ময়। ঈশ্বরের নাম কীর্তন ও জীবসেবা ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা। নানকের 'দোহা' বা ভজনগানগুলি 'গ্রন্থসাহেব' নামক শিখ ধর্মগ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। পাঞ্জাবী সাহিত্যের তাহা অতুলনীয় সম্পদ।

গুরুনানক

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার তালবন্দি গ্রামে এক সাধারণ গৃহস্থের ঘরে নানকের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই নানকের মন ছিল ধর্মের দিকে। তাঁহার পিতা উদাসী ছেলেকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। কিছুদিন নানক সুলতানপুরে সরকারী চাকুরিও করিয়াছিলেন। যাহা উপার্জন করিতেন তাহা সাধুসেবাতেই ব্যয় করিতেন। ক্রমে নানকের ভজন গানের প্রভাবে গড়িয়া উঠে এক ভক্তমন্ডলী। মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান তিনি ভ্রমণ করেন, মক্কা-মদিনাও তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। তবে তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল করতারপুর। নানকের সরল ধর্মে হিন্দু-মুসলমান সকলেই আকৃষ্ট হইত। তিনি বলিতেন, পরমেশ্বর সর্বভূতে আছেন 'সৎ' তাঁহার নাম, তাঁহার নামগান করাই একমাত্র ধর্ম। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নানক দেহত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে দশম গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে গড়িয়া উঠে 'খালসা' বাহিনী।

(ঘ) **সুলতানী যুগে বঙ্গদেশ—সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ** সুলতানী শাসনের প্রথমদিকে সুলতানগণ ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও উগ্র হিন্দু-বিদ্বেষী। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে সে এক অন্ধকারময় যুগ। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী সুলতানগণের আগ্রহে পুনরায় নূতন নূতন সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়। তাঁহারা ছিলেন শিল্পানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের কোতোয়ালী দরোয়াজা, বড় সোনা ও ছোট সোনা মসজিদ প্রভৃতি তাঁহাদের উৎসাহে নির্মিত হয়।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ণ। আজও ইহা বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়। এই সময়েই আবির্ভাব হয় মিথিলার

কবি বিদ্যাপতি ও বাংলার লোকপ্রিয় কবি বড়ু চণ্ডীদাসের। চণ্ডীদাসের 'বৈষ্ণব পদাবলী' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সুলতান হুসেনশাহ ও তাঁহার পুত্র নসরৎশাহ গুণী ও বিদ্বানদের যোগ্য সমাদর করিতেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এই সময়ে রচিত হয়। কবি মালাধরবসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করিয়া সুলতান কর্তৃক 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। হুসেনশাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আগ্রহে বাংলায় সংক্ষিপ্ত মহাভারত রচনা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। ইহা 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। পরাগলের পুত্র ছুটী খাঁর নির্দেশে সুলতান নসরৎশাহের সময়ে শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। হুসেনশাহী যুগের আর এক বিশিষ্ট অবদান মঙ্গলকাব্য। সতী বেহুলার আখ্যান লইয়া বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত প্রমুখ কবিগণ একাধিক মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। গৌড়ের মানিকদত্ত সৃষ্টি করেন চন্ডীমঙ্গল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে রচিত হয় বহু মধুর পদাবলী, মহাপ্রভুর জীবনী ও কড়চা প্রভৃতি। চৈতন্যশিষ্য রূপ গোস্বামী রচিত 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' কাব্য দুইটি সংস্কৃত সাহিত্যে এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। রামানন্দ রায়, পরমানন্দ সেন (কবি কর্ণপুর) শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ কবিগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাতেও বাংলাদেশ তখন ছিল খুবই উন্নত। নবদ্বীপ ছিল ইহার প্রধান কেন্দ্র। রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের খ্যাতি ছিল সারা ভারতে। স্মৃতিশাস্ত্রেও শূলপাণি ও রঘুনন্দন বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া সমাজব্যবস্থার নূতন ধারা প্রবর্তন করেন।

সমাজ ও ধর্ম : ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী সুলতানদের উদারতা ও বিচক্ষণতার ফলে সাহিত্যে এবং ধর্ম ও সমাজে নূতন চিন্তাধারার বিকাশ হয়। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। হিন্দুর পূজাপার্বণে মুসলমানরাও উৎসব করিত, মুসলমান পীরের দরগাতে হিন্দুরাও সিন্নি চড়াইত। এইভাবে দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ে উদ্ভব হইল সত্যপীরের পূজা। হিন্দুরা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ জ্ঞান করিয়া থাকে। ক্রমে সামাজিক ও ধর্ম সংস্কারের ফলে দুই সমাজেই রক্ষণশীল কঠোরতা হ্রাস পায় ও সৌহার্দ্যের ভাব গড়িয়া উঠে।

আর্থিক অবস্থা : সুলতানী যুগের আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা এবং ইবনবতুতা, নিকোলো

কোন্তি, মাহুয়ান, বারবারোসা প্রভৃতি বিদেশী ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত হইতে। দিল্লী হইতে বেশ দূরে অবস্থিত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহী হইত। তাহা হইতেই বুঝা যায় যে বাংলাদেশ সম্পদশালী ছিল। দেশের ঐশ্বর্যের মূল ভিত্তি ছিল কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী। তাহাদের উপরেই নির্ভর করিত সুলতানের ও আমীরদের সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা। কৃষিজ পণ্যের প্রাচুর্যের ফলে বাজার দর ছিল অত্যন্ত কম। ইবন্‌বতুতার মতে জিনিসপত্রের এত কম দাম পৃথিবীর আর কোথাও তিনি দেখেন নাই। ধান, চাউল, চিনি, ঘি, সরিষার তৈল, মিহি কাপড়, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি বাজার দরের একটি তালিকা দিয়েছেন, যাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। চীনা দূত মাহুয়ানের বর্ণনায় আছে নানারকম শস্য, শাক-সব্জী ও ফল-মূলের দীর্ঘ তালিকা, বিশেষ করিয়া আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতির। পোর্তুগীজ পর্যটক বারবারোসা বাংলার রাজধানী গৌড় ('বাঙ্গালা') এবং সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচুর তুলা চাষের জমি, নানারকম ফলের বাগান ও প্রচুর স্বাস্থ্যবতী গাভী ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু লক্ষ্য করিয়াছেন। বাংলার শিল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অত্যন্ত মিহি বস্ত্র (মসলিন), যাহা ভারতের সকল প্রান্তে রপ্তানি হইত। আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজারেও যেমন ইহার চাহিদা ছিল, তেমনই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মলাক্কা, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে। ইহাই ছিল বাংলার সুলতানদের ঐশ্বর্যের উৎস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষক ও শ্রমিকরাই অত্যাচারিত হইত বেশী। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না।

(ঙ) **সুলতানী আমলে শাসনব্যবস্থার রূপরেখা :** দিল্লীর সুলতান ছিলেন বাগদাদের খলিফার প্রতিনিধি, রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। কিন্তু তাঁহাকেও মানিয়া চলিতে হইত ইসলাম ধর্মের নিয়মকানুন, নির্ভর করিতে হইত উলেমাদের ও আমীর-ওমরাহদের সহযোগিতার উপর। ফলে তিনি একেবারে স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। সুলতান বাস করিতেন বহু মহলযুক্ত ঐশ্বর্যমন্ডিত প্রাসাদে। আমীর-ওমরাহ পরিবৃত হইয়া প্রতিদিন সুসজ্জিত 'দরবার' কক্ষে সুলতান শাসনকার্য করিতেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উজীর সেনানায়কদের ও আমীরদের সহিত পরামর্শ করিতেন গুপ্ত মন্ত্রণাকক্ষে।

উজীর ছিলেন সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী। কোষাগার ও অর্থদপ্তরের তিনি ছিলেন পরিচালক। রাজস্ব আদায়, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, মুখ্য

কর্মচারীদের নিয়োগ প্রভৃতি নানারকম কাজের দায়িত্ব ছিল উজীরের। ধর্মীয় শিক্ষা ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন 'সদর-উস্-সুদুর'। দীওয়ান-ই-আরজ্-এর উপর ভার ছিল সেনাবিভাগের। সুলতানের হুকুমনামা ও ফারমান্ জারি করিতেন দাবীর-ই-খাস্। আরও বহু ছোট বড় কর্মচারী বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন।

রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের এক-পঞ্চমাংশ। বিধর্মী হিন্দুদের দিতে হইত বার্ষিক জিজিয়া কর মাথাপিছু ২০/৪০ 'তন্খা' (টাকা) হিসাবে। ইহা ছাড়া বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক, খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধনের অংশ ও যুদ্ধে বিজিত ধনরত্ন হইতেও কোষাগারে প্রচুর অর্থাগম হইত। অনেক সময়ে মুখ্য কর্মচারীদের নগদ মাহিনার বদলে জমি দান করা হইত। ফলে রাজ্যে সামন্তপ্রথার বিস্তার ঘটে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো ছিল মোটামুটি কেন্দ্রের মত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ করিতেন সুলতান, তাঁহারই নির্দেশে তাঁহারা রাজ্য শাসন করিতেন। সুদূর বাংলার শাসনকর্তারা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। প্রতি প্রদেশ আবার কতকগুলি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল, তাহার নিম্নে ছিল 'শিক্' ও 'পরগনা'। পরগনা ও শিক্ শাসন করিতেন 'আমিন' ও 'শিকদার'। সরকারের প্রধানকে বলা হইত শিক্দার-ই-শিকদারান্। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—'আমিন' (গ্রাম্য জমির মাপজোখ করিতেন), 'মুন্সিফ্' (গ্রামাঞ্চলের বিচারক ছিলেন), কারকুন ও 'কানুনগো' (জমির হিসাব রাখিতেন)। শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। তাহা চলিত পঞ্চায়েতের নির্দেশে, যাহার প্রধান ছিলেন 'মোড়ল' ও তাঁহার সহকারী 'পাটোয়ারি'।

অনুশীলনী

১। সুলতান মাহমুদ কে ছিলেন? তাঁহার ভারত অভিযানের ফলাফল কি হইয়াছিল?

২। মুহম্মদ ঘুরী কোন্ রাজপুত রাজাকে পরাজিত করেন? তিনি কোন্ সালে দিল্লীর সম্রাট হন?

৩। দাস সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? কেন তাহাদের এইরূপ নাম হয়? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কাহাকে বলা যায়?

৪। খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা কে করেন? তাঁহার সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল?

৫। মুহম্মদ তুঘলককে 'পাগলা রাজা' বলা হয় কেন? তিনি কি কি নূতন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন? সেগুলি ব্যর্থ হয় কেন?

৬। ভক্তিবাদ কাহাকে বলে? কয়েকজন ভক্তিবাদী সাধকের নাম কর। সুফী সাধকদের সম্বন্ধে কি জান।

৭। কবীর কিভাবে রামানন্দের শিষ্য হন? তাঁহার ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান?

৮। শ্রীচৈতন্যদেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখ। বাংলার ধর্মান্দোলনে তাঁহার অবদান কি?

৯। শিখ্ কথার অর্থ কি? শিখধর্মের প্রবর্তক কে? তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১০। সুলতানী যুগে বাংলা সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল?

১১। সুলতানী যুগে বাংলার আর্থিক আবস্থা কিরূপ ছিল?

১২। সুলতানী আমলে শাসনব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৩। সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দাও।

(ক) মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত করেন—পৃথ্বীরাজকে / জয়চন্দ্রকে।

(খ) কুতুবুদ্দীন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান হন ১২০৩/১২০৬/১২১০ খ্রীঃ

(গ) ভারতে মুঘল রাজত্বের অভ্যুদয় হয়—১৩৯৮/১৫১৭/১৫২৬ খ্রীঃ।

(ঘ) কবীর কাহার শিষ্য ছিলেন?—শ্রীচৈতন্য/রামানন্দ/রামদাস।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যদেব কোথায় দেহরক্ষা করেন?—নবদ্বীপ/বৃন্দাবন/পুরী।

(চ) বাংলা রামায়ণ কাহার রচনা?—বিদ্যাপতি/কৃত্তিবাস/চণ্ডীদাস।

১৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর: (ক) ভারতীয় রাজাদের কাছে মাহ্মুদ ছিলেন মূর্তিমান —। (খ) তরাইনের প্রথম যুদ্ধে — জয়ী হইয়াছিলেন। (গ) কুতুবুদ্দীন ছিলেন — ক্রীতদাস। (ঘ) ইলতুৎমিস তাঁহার কন্যা — সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী — করেন। (ঙ) আলাউদ্দীনের দক্ষিণ ভারত অভিযানে নেতৃত্ব করেন — —। (চ) মুহম্মদ তুঘলককে অনেকে —— বলিয়া থাকে। (ছ) — খ্রীষ্টাব্দে সমরখন্দের সেনানায়ক —— আক্রমণে—নগরী শ্মশানে পরিণত হয়। (জ) চৈতন্যদেব প্রবর্তন করেন সমবেত ভাবে —— সংকীর্তন।

১৫। সংক্ষেপে লিখ: সবুক্তিগীন, জেহাদ, রাজিয়া, ইবনবতুতা. গ্রন্থসাহেব, সত্যপীর, উর্দু ভাষা, উজীর ও সদ্র-উস্-সুদূর, শিকদার-ই-শিকদারান, গুণরাজ খাঁ, পরাগলী মহাভারত, রাজা দাহির, মালিক কাফুর,

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের শেষ পর্ব (১৪শ—১৫শ শতাব্দী)

(ক) **কনস্টান্টিনোপলের পতন ঃ** বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য উন্নত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে সাম্রাজ্য স্বভাবতঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে শ্লাভ জাতির আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার পর আক্রমণ করে হূণদের মত মঙ্গোল জাতির দুইটি শাখা—আভার ও বুলগার। আরও বেশী বিপদের কারণ হয় দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে পারসীক, আরব ও তুর্কীদের আক্রমণ।

সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। অবশ্য বাইজান্টাইন সম্রাট হেরোক্লিয়াস শেষ পর্যন্ত পারসীকদের পরাভূত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে উভয়েরই যথেষ্ট শক্তিহানি ঘটে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে আরবরা। তাহাদের আক্রমণে পারস্য ও বাইজান্টাইন দুই সাম্রাজ্যই ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিরিয়া, মিশর ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকা আরবদের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। আরব বাহিনী দুইবার কনস্টান্টিনোপল অবরোধও করিয়াছিল। 'গ্রীক আগুন' (Greek fire) নামে এক প্রকার নূতন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। উহা এমন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত হইত যে জলের উপরেও সমানভাবে জ্বলিত। ইহার পর একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কীদের প্রচণ্ড আক্রমণে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য পুনরায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মোক্ষম আঘাত হানিয়াছিল অটোমান তুর্কীবাহিনী। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন সংকুচিত হইয়া কনস্টান্টিনোপল ও তাহার উপ-কণ্ঠে সীমাবদ্ধ। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন হইলে সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হইয়া যায়। শেষ হয় মধ্যযুগেরও।

(খ) **মধ্যযুগের অবসান ও রেনেশাঁসের অভ্যুদয় ঃ** ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসানে শুরু হয় রেনেশাঁসের যুগ। রেনেশাঁস একটি ফরাসী শব্দ। ইহার অর্থ নবজাগরণ বা প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইটালীতে এই নবজাগরণের প্রকাশ দেখা যায়। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে এই নূতন ভাবধারা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই ইউরোপীয় রেনেশাঁস

তোমরা জান যে, বাইজান্টাইন সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় কনস্টান্টিনোপলে গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রীক কাব্য ও সাহিত্য এবং ধর্ম ও দর্শনচর্চার প্রধান কেন্দ্র। সাম্রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছিল প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের গ্রন্থসম্ভার। এমন কি কনস্টান্টিনোপলের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় অর্থোডক্স গ্রীক চার্চ বলিয়া পরিচিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য পশ্চিমী রোমান সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ফলে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা কনস্টান্টিনোপলেই সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

তুর্কী আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতন আসন্ন হইলে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুঁথিপত্রের সংগ্রহ শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ইটালীতে পলাইয়া যান। ইটালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি শহর হয় তাহাদের নূতন আশ্রয়স্থল। তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে সেখানে নবোদ্যমে শুরু হয় গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন। অতএব দেখা যায় যে কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে ইটালীই হইয়া উঠে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের কেন্দ্রভূমি।

কনস্টান্টিনোপলের পতন নিঃসন্দেহে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ইহা কি বলা যায় যে কনস্টান্টিনোপলের পতনের পরদিন হইতে মধ্যযুগ শেষ হইয়া রেনেশাঁস যুগ শুরু হইল? যুগের পরিবর্তন নির্দিষ্ট দিন বা তারিখ অনুযায়ী ঘটে না, ইহা ঘটে ধীর মন্থরগতিতে মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ফলে। তবে বিশেষ বিশেষ ঘটনার প্রভাবে সেই গতি ত্বরান্বিত হয়। তাহাই হইয়াছিল কনস্টান্টিনোপলের পতনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে।

(গ) **রেনেশাঁসের লক্ষণ:** রেনেশাঁসের মূল বৈশিষ্ট্য হইল এষণা বা অজানাকে জানার ইচ্ছা ও আগ্রহ এবং যুক্তিবাদ। প্রাচীন শাস্ত্র বা ধর্মীয় তত্ত্বের অন্ধ অনুসরণ নহে, অলৌকিক বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করাও নহে, যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণ ছিল নূতন যুগের পণ্ডিতদের আদর্শ। এইরূপ গবেষণার নীট ফল হইল জ্ঞানের বিস্তার ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সাধারণ ভাবে রেনেশাঁসের যুগ বলা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মৌলিক যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশ হয় আরও প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। ঐ সময়েই গড়িয়া উঠিয়াছিল মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যেমন ইটালীর বোলোনা, র‍্যাভেনা